এদিকে ইংরেজ ওদিকে সন্ন্যাসী

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

প্রথম প্রকাশ :
১৫ এপ্রিল, ১৯৬২
১ বৈশাখ, ১৩৬৯

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী লীলা রায়
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

মলাটের ছবি : চারু খান
ভিতরের ছবি : বিষ্ণু সামন্ত

এদিকে ইংরেজ

ওদিকে সন্ন্যাসী

মাঝখানে

'খেলাঘর' পত্রিকার জন্যে সম্পাদক বন্ধুবর দেবকুমার বসু-র অনুরোধে 'এদিকে ইংরেজ ওদিকে সন্ন্যাসী' লেখার পর পত্রিকাটি অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং লেখাটি সম্পাদকের দপ্তরে পড়ে থাকে।

'সাহিত্যশ্রী'-র তপনকুমার ঘোষের আগ্রহে ও উৎসাহে লেখাটি এতদিনে প্রকাশ পেল। চিত্রশিল্পী বিষ্ণু সামন্ত গল্পটির ভিতরের ছবিগুলি বহুদিন আগে এঁকে দিয়েছিলেন এবং দেবকুমার বসু তাঁর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ব্লক করে রেখেছিলেন। সেই ব্লকগুলি এই পুস্তকে ব্যবহার করতে দিয়ে শ্রীবসু তাঁর স্বভাব-সুন্দর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীসামন্তকে ধন্যবাদ জানাই। চারু খান-এর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তিনি মলাটের ছবি এঁকে দিয়ে সেই সম্পর্ক দৃঢ়তর করলেন।

লেখকের অন্যান্য বই :

সিংহাসনে রাজা নেই

বাধা দিলেই লড়াই

রাজসিক (নাটক)

উৎসর্গ

এদিকে : রাজা বাপ্পা বুম্বা (চন্দননগর)

ওদিকে : শান্তা বুনু বাবু (শান্তিনিকেতন)

—তোমরা এখন ছোট, বড় হয়ে
লড়তে শিখো।

—বাবা/পিসেমশাই

এক

দুই বন্ধু

অভিন্ন-হৃদয় দুই বন্ধু। একজন হিন্দু অন্যজন মুসলমান। মেঘনাদ আর মকবুল। এমন বন্ধুত্ব বেশি দেখা যায় না। নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গেই শুধু নয়, মিল ওদের কর্মে ও মর্মে। প্রায় সমবয়সী দুজনে—চোদ্দ-পনেরোর মধ্যে বয়স। একসঙ্গে ওঠাবসা একসঙ্গে খেলাধুলা, একসঙ্গে ঘোরাফেরা। ওদের দৌরাত্ম্যে পাড়া-প্রতিবেশীরা অস্থির। বুদ্ধি যেমন সাহসও তেমনি।

মকবুল ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবান। সেজন্যে ওকে মেঘনাদের চেয়ে বড়ই দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সে ছ-মাসের ছোট। মেঘনাদের গায়ের রঙ ঈষৎ ময়লা, কপাল উঁচু, চোয়ালের গড়নে কিছু পার্থক্য আছে, অনেকটা চৌকো মতন। তবু দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ালে বেমানান দেখায় না। লোকে বলে, মানিক-জোড়। দুজনেরই মাথা-ভরা ঘন কালো চুল। বড় বড় চোখ, দুষ্টুমি ভরা। আর খুব চঞ্চল।

সংসারে মেঘনাদের আছে শুধু বাপ, মকবুলের শুধু মামা। দুজনেই শৈশবে মাতৃহারা। মকবুলের একটু বেশি—ওর বাবাও নেই। দুই অভিভাবকের সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তা—তাঁদের ছেলে ও ভাগনে কার বাড়িতে কখন কী করে বসে, কে বা কারা নালিশ জানিয়ে যায়। ওরা ভয় পায় না কোনো কিছুতে। পাড়ায়-পাড়ায় ছুটোছুটি, বাগানে-বাগানে হুটোপাটি। সবেতেই ওদের মজা। সঙ্গীও জোটে প্রচুর। ওদের দলটি বেশ ভারী। ক্ষুদে পল্টন একটি।

ওরা অস্থির ছেলেবেলা থেকেই—চঞ্চল, ছটফটে। হয়তো কারো বাগানের আম ধ্বংস করে ছুটল জমিদার-বাড়ির দিকে। কদিন

থেকে লক্ষ্য করেছে জমিদার-বাড়ির বারান্দায় খাঁচার ভেতরে বন্দী রয়েছে মস্ত এক পাহাড়ী ময়না। পাখিটা ডানা ঝাপটায়—উড়ে যাবার চেষ্টা করে খালি। তার ব্যর্থ প্রয়াস বহুদূর থেকে লক্ষ্য করা গেছে। অতএব অভিযান পরিচালনা করে মেঘনাদ একা পা টিপে-টিপে উঠল ওপরের বারান্দায় এবং চাকর তেড়ে আসার আগেই মুক্ত করে দিল পাখিটাকে—ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল পাহাড়ী ময়না। মেঘনাদ হাততালি দেয় আনন্দে আর চাকর চেঁচায় রাগে।

চাকরের চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে আসেন স্বয়ং জমিদারমশাই। তিনি শূন্য খাঁচার দিকে এক পলক তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠেন: 'এই হতভাগা, আমার সাধের পাহাড়ী ময়না উড়িয়ে দিলি কেন?'

মেঘনাদ আল্‌সের কাছে সরে গিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে: 'বাঃ বেশ বললেন! পাহাড়ের ময়নাকে কেউ বুঝি বাড়ির খাঁচায় বন্দী করে রাখে? ওর কষ্ট হয় না বুঝি?'

'দাঁড়া, তোর দরদ দেখাচ্ছি—'

জমিদারমশাই তেড়ে গেছেন আর মেঘনাদ আল্‌সে টপকে দিয়েছে এক লাফ। দেখে, জমিদারমশাইয়ের চক্ষুস্থির। সাংঘাতিক ছেলে তো!

'কী ডাকাবুকো ছেলে রে বাবা! এত উঁচু থেকে লাফ! হাড়-গোড় ভাঙল কিনা কে জানে।'

না, হাড়গোড় ভাঙেনি। পল্টন-বাহিনী মাটি কুপিয়ে রেখেছিল আগে থেকে। সে লাফিয়ে পড়েছিল বাগানের নরম মাটিতেই। তারপর দৌড়। চাকর বা অন্য কেউ তাড়া করতে পারে মনে করে বেপাড়া দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সবাই হাজির আমবাগানের সেই নিরাপদ আস্তানায়। সেখানে অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মকবুল ব্যাপারটা জানত না। দক্ষিণ-পাড়ার সঙ্গীদের নিয়ে মেঘনাদের এটা একক পরিকল্পনা। উত্তর-পাড়ার মকবুল বা তার

দল এ-সব জানত না বলে ওরা সবাই অবাক হল। মকবুল বলে, 'আরে, হাঁপাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?'

মেঘনাদ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'জমিদারের ময়না উড়িয়ে দিয়েছি বলে তাঁর কী রাগ! আচ্ছা, তুই বল, বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে রাখলে কষ্ট হয় না?'

'বেশ করেছিস।' মকবুল একটু থেমে বলে, 'মেঘা রে, এইরকম করে যদি বিদেশী মানুষগুলোকে আমাদের দেশ থেকে বার করে দেওয়া যেত! চারদিকে কী অত্যাচার! দেশের মানুষগুলো কুকুর-বেড়ালের মতন মার খাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে। অসহ্য!'

'সত্যি।' মেঘনাদের দৌড়ের হাঁপানি কমে এসেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। সে বলে, 'এখন দেশের যা অবস্থা, আমরা ছোটরা, কী করতে পারি বল্? এই সময়ে আমাদের একজন নেতার বড় দরকার—'

'হুঁ নেতা!' মকবুল বলে, 'জানিস মেঘা, আমি মনে-মনে একটা ডাক শুনতে পাই। নেতা শিগগির আসবেন। দেখিস্, তখন আমরা যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি। তিনি আমাদের ডাকবেনই।'

'কীভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে বল্?'

'আরও মহড়া চাই—'

'বেশ। আজ তলোয়ারের মহড়া হোক। মকবুল, তুই দেখ্ আমরা কে কি-রকম লড়ছি।'

'শুরু কর—'

আমবাগানের নিভৃত আস্তানায় অতঃপর শোনা যায় শুধু তলোয়ারের ঝনঝন শব্দ। মহড়া জমে ওঠে। দাঁড়িয়ে ছাখে দুই বন্ধু। তারা অংশগ্রহণকারী সঙ্গী-সাথীদের ভুল শুধরে দেয়—কখনও উৎসাহ দেয়। কারও চোট লাগলে বনের গাছ-গাছড়ার রস নিঙড়ে ক্ষতস্থানে বেঁধে দেয়। আবার চলে মহড়া।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সেদিনের মতন সকলে বাড়ি ফিরে যায়।

মেঘনাদ বাড়ি ফিরে বকুনি খায় বাবার কাছে। বুড়ো বাপ—সাদাসিধে মানুষ। সে যত নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায় হতভাগা ছেলে ততই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তোলে। এই ছেলের জন্যে ঘুমিয়ে শান্তি নেই, জেগে স্বস্তি নেই। বড় অবাধ্য। শাসন মানে না, শোধন হয় না।

দক্ষিণ-পাড়ায় মেঘনাদের বাস, উত্তর-পাড়ায় মকবুলের। এ-গ্রাম ও-গ্রাম। দূরত্ব অল্পই। বন্ধু মেঘনাদকে বিদায় দিয়ে মকবুল এসে ওঠে মামার বাড়ি। তার বাবা নেই, মা নেই, সে মামার সংসারে মানুষ ছোটবেলা থেকে। সেজন্যে দুর্ভোগের শেষ নেই। বাবা-মা না থাকায় প্রতিপালক মামার কাছে সে আদরের চেয়ে অবহেলা পেয়েছে বেশি—দিনে দিনে তার মন বিষিয়ে উঠেছে সংসারের প্রতি। ঘরের চেয়ে বাইরের দিকে টান বেড়েছে। দুবেলা দুমুঠো আহারের বিনিময়ে তাকে যেতে হয় মামার সঙ্গে মাঠে—হাত দিতে হয় মাঠের কাজে। ভাল লাগে না। অধিকাংশ দিন ঠিক সময়ে সে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকে ইচ্ছা করেই। ফলে কপালে জোটে বকুনি—আহার বন্ধ প্রায়ই। তবু পরিবর্তন নেই ছেলেটার।

সারাদিন গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে সে টো-টো করে ঘুরছে—সংসারের কাজ ছাড়া অন্য সব কাজে তার প্রচণ্ড উৎসাহ। সে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয় আমবাগানে—ছেলের দল নিয়ে বোঁ-বোঁ লাঠি ঘোরায়, তীর ছোঁড়ে, তলোয়ার চালায়। ফাঁক পেলেই গাঁয়ের তহসিলদারের টাট্টু ঘোড়াটা খুলে নিয়ে বেগে ছোটায়। রৈ-রৈ শব্দে বেরিয়ে আসে তহসিলদার। কিন্তু মকবুল তখন মাঠ পেরিয়ে দক্ষিণ-পাড়ার বাঁকে—যেখানে দোস্ত মেঘনাদ আছে অপেক্ষায়।

বিভিন্ন সময়ে মিলিত হবার জন্যে ওদের বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সকালে এক জায়গা বিকালে অন্য জায়গা, সন্ধ্যায় আর এক জায়গা। উদ্দেশ্য হল, কেউ যাতে সহজে ওদের নাগাল না পায়। উলটো-পালটা জায়গায় দেখা-সাক্ষাৎ। এই ওলোট-পালোট জানে শুধু দুই বন্ধু আর দলের কিছু সাকরেদ।

মকবুল টাট্টু থেকে নেমে বলে, 'মেঘা রে, এইরকম একটা ঘোড়া আমার চাই। তুই চড়ে গ্যাখ কী তেজী ঘোড়া—যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়—'

'তাই নাকি! আচ্ছা দে দেখি।'

ঘোড়ায় চড়া মেঘনাদের বেজায় সখ। সে তখনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে জোরে ছিপটি চালায়। ঘোড়া ছোটে টগবগিয়ে।

কিন্তু ফিরে আসে খানিক পরে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামে মেঘনাদ। বলে, 'এই মকবুল, তহসিলদার ভীষণ চটে গেছে। শিগগির ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে আয়। তোকে খুঁজছে। নইলে তোর মামার কাছে নালিশ করবে—'

'ব্যাটা মামাকে চিনেছে ঠিক। আরে, আমি কী ওর ঘোড়া চুরি করেছি, নাকি ফিরিয়ে দেব না বলেছি? সখ হয়েছিল, একটু চড়েছি, তাতেই এত কাণ্ড!'

'যা ভাই—'

'যাচ্ছি।'

মকবুল টাট্টু নিয়ে তহসিলদারের বাড়িতে আসে। বাধ্য ছেলের মতন যথাস্থানে ঘোড়া বেঁধে রাখে। গ্যাখে, তহসিলদার চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। সে বলে, 'তহসিল-দাদা, ভারী সুন্দর টাট্টু তোমার। মাঝে মাঝে ছোটাবে, নইলে তোমার মতন বেতো হয়ে যাবে—'

'কী বললি?'

'মানে, আমি ছুটিয়ে তোমার কাজ এগিয়ে রেখে গেলুম—'

বলেই সরে পড়ে মকবুল।

'হতভাগা ছেলে!' তহসিলদার গজগজ করে: 'আমার মতন বেতো হয়ে যাবে! উপকার করে গেলে! যত্ত সব—'

দুই

মোগলহাটের মেলায়

উত্তর-পাড়ার আমবাগানে মকবুলের আড্ডা। দক্ষিণ-পাড়ার বটতলায় মেঘনাদের আড্ডা।

মেঘনাদের আড্ডায় যেমন চলে যুদ্ধের মহড়া, মকবুলের আড্ডায় তেমনি চলে তলোয়ার খেলা, লাঠি চালনা, তীর ছোঁড়া। এই তিনটি বিষয়ে মকবুল ওস্তাদ। নিজের যোগ্যতার গুণেই সে ওস্তাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে সঙ্গীদের কাছ থেকে। তাকে মান্য করে সবাই। সে যত্ন করে শেখায়। তার সঙ্গে কোনো সাকরেদ হয়তো সমান-সমান যোঝে। মকবুল তার পিঠ চাপড়ে দেয়। বলে, 'সাবাস! এমনি করে কব্জির জোর তৈরি কর। নবাবকে যে বিশ্বাসঘাতকের দল হত্যা করেছে এ-রকম করেই তাদের খতম করবি—'

'কিন্তু লড়ব কবে?' জানতে চায় সাকরেদ।

'শিগগির সেদিন আসবে রে—'

'কবে?' সাকরেদ যেন অধৈর্য।

'ঠিক জানি না। তবে আসবে শিগগির। আসবেই—'

মেঘনাদ এসে হাজির হয়। হেঁটে নয়, ঘোড়ায় চড়ে। হাসিখুসি ভাব। ঘোড়ায় চড়ে আসার আনন্দ।

মেঘনাদ বলে, 'এই মকবুল, মেলায় যাবি না?'

মকবুল আড়চোখে তাকায়। বলে, 'বেশ ঘোড়াটা। কোথায় পেলি রে?'

'আমার বাবার বন্ধুর ঘোড়া।' মেঘনাদ বলে, 'তাঁকে জ্যাঠা বলি। জ্যাঠার এখন বয়স হয়েছে। ঘোড়াটা আস্তাবলে বাঁধাই

থাকে। মোগলহাটের মেলায় যাচ্ছি শুনে নিজেই দিয়ে দিলেন। ঘোড়াটা তবু ছুটবে।—হ্যাঁ রে তুই যাবি না?'

মকবুল বলে, 'নাহ্। তুই যা। হেঁটে যেতে গেলে আমার অনেক দেরি হয়ে যাবে—'

অভিমানের ছোঁয়া ওর গলায়। অর্থাৎ বন্ধু যাবে ঘোড়ায় চড়ে আর সে যাবে কিনা পায়ে হেঁটে। মনটা যেন কেমন হয়!

বুঝতে পারে মেঘনাদ। সে ঘোড়া থেকে নামে। লাগাম তুলে দেয় বন্ধুর হাতে। বলে, 'মকবুল, এ ঘোড়া বড় পাজী। আমি জুত করতে পারব না। শায়েস্তা হবে তোর হাতে। নে ধর্—'

'তুই?'

মেঘনাদ বলে, 'আমার জন্যে ভাবিসনে। আমি ষষ্ঠী ধোপার গাধাটা জোগাড় করে আনছি—'

'গাধা! সে কী! লোকে কী বলবে!'

মেঘনাদ বলে, 'লোকের কথায় আমার ভারি বয়েই গেল। গাধার পিঠে ধোপারা কী চড়ে না? বেশি বকিস নে, তুই ঘোড়ায় চড়ে বস্ তো—'

'ধু-উ-র! তা কী হয়?'

মেঘনাদ যেন রেগে গেল: 'হয়, খুব হয়। যা বলছি শোন্। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুই উঠে পড়—'

এক-রকম জোর করেই তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল মেঘনাদ।

'এই বেশ হয়েছে। দাঁড়া, আমি আসছি—'

বলে মেঘনাদ চলে যায় ষষ্ঠী ধোপার কাছে। ষষ্ঠী ধোপা কাছেই থাকে। তার সঙ্গে খুব ভাব। ধোপার কাছ থেকে সে সংগ্রহ করে আনল বাহনটা।

মকবুল ঘোড়ার পিঠে আর মেঘনাদ গাধার পিঠে···দুই বন্ধু গল্প করতে করতে চলেছে মোগলহাটের মেলায়। বাহন দুটিকে ওরা চালাচ্ছে ধীরগতিতে। পেছনে আসছে সঙ্গী-সাথীরা।

মস্ত বড় মেলা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মেলা বসেছে। গ্রামের মধ্যে সেরা মেলা। লোক চলেছে দলে দলে। কথা বলছে পরস্পর, কিন্তু উচ্ছ্বাসের অভাব। কেমন যেন মন-মরা। আগে-পিছে কত লোক, কোথাও দল-বাঁধা কোথাও-বা ছাড়া-ছাড়া। পাশ দিয়েও চলেছে লোকেরা। তাদের আলোচনার টুকরো কানে আসছিল। সেই আলোচনায় সুখের চেয়ে দুঃখ, আনন্দের চেয়ে আশংকার কথাই বেশি।—কী দিনকাল পড়েছে! পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, মানুষ না খেয়ে মরছে, তবু খাজনা আদায়ের জুলুম আছে পুরোদস্তুর। প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে এই ইংরেজ-কোম্পানি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে মানুষ কত সুখে ছিল! আ-হা সেদিন কী আর আসবে···

নানা অসংলগ্ন কথার মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম কানে যেতেই মকবুল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। লাগামে টান পড়ল, ঘোড়া চিঁহি করে উঠল। সামনের পা-দুটো তুলেছিল ঘোড়া, মকবুল পড়ে যেত। সামলে নিল। মেঘনাদ পাশে ছিল, সে বলল, 'কী রে, ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন?'

'দোষ আমারই। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।' মকবুল বলে, 'মেঘনাদ, তুই সিরাজের মৃত্যুর পরের ব্যাপারটা জানিস?'

'কী করে জানব?' মেঘনাদ বলে, 'আমি তখন জন্মাইনি।'

'আমিও। তবে খুব পুরনো ঘটনা নয়। আমি শুনেছি মামার কাছে—'

'কী শুনেছিস?'

'মামার কাছে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিল এক ফকির। দু-চার কথার পর মামা জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফকির-সাহেব, মুর্শিদাবাদের খবর কী?'

'নসিব। সবই সিরাজের নসিব।' ফকির-সাহেব কপাল চাপড়ে বলেছিলেন, 'নইলে এমন হবে কেন?'

'আপনি খুলে বলুন ফকির-সাহেব—'

'খুলে কী বলব? তুমি দুঃখ পাবে। সে দৃশ্যের বর্ণনা খুলে বলা যায় না।'

'আপনি নিজের চোখে সে-দৃশ্য দেখেছিলেন?'

মামা অধৈর্য হয়ে ওঠে।

'নইলে এত দুঃখ পাব কেন?' ফকির-সাহেব বলেন, 'তখনও সংসারী মানুষ আমি, ওই দৃশ্য দেখার পরে এই ফকিরি গ্রহণ করেছি। 'মালুম হয়ে গেছে সংসার কী বিষম জায়গা—'

'আপনি কী দেখলেন ফকির সাহেব—'

'তখন আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে।' তিনি বলেন, 'দেখি, লোক ছুটছে কাতারে কাতারে। বুক চাপড়াচ্ছে। যেন এক ভীষণ সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি কিছু। আমার মন ভার হয়ে ছিল আগে থেকেই। কারণ, জেনেছি, মহম্মদী বেগের হাতে নবাব মারা গেছেন গতকাল। কিন্তু আজ এভাবে লোক ছুটছে কেন বুক চাপড়াতে চাপড়াতে? কী হল?'

'বুঝতে পারলেন?'

'পারলুম বই-কি।' তিনি বলতে থাকেন: 'খানিক পরেই বোঝা গেল। দেখি, সেই হাতিটা আসছে, যার নগ্ন পিঠে নবাবের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ অশ্রদ্ধায় শুইয়ে রাখা। শিকার-করা জন্তুকে যেভাবে রাখে। নগর-পরিক্রমা করে সাধারণ মানুষকে দেখান হচ্ছে যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর বেঁচে নেই। আমি হাতিটার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম—'

'আপনি কতদূর গিয়েছিলেন?'

'আমরা তখন নবাবের প্রাসাদের সামনে, খুব ভিড়।' তিনি বলে যাচ্ছেন, 'প্রাসাদে তখন ছিলেন হতভাগ্য নবাবের জননী আমিনা বেগম। হাতি আসছে শুনে তিনি খালিপায়ে আর আলুথালু বেশে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন রাস্তায়। বেগম-সায়েবা

বে-আবরু সকলের সামনে বেরিয়ে এসেছেন দেখে, পাশের অট্টালিকার এক আমীর, তাঁর দাসী-বাঁদী নিয়ে ছুটে এসে তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। বেগমের ইজ্জৎ-রক্ষায় তিনি তৎপর। দেখলুম, আমিনা বেগমের বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে—'

'তারপর?'

'হাতি চলেছে।' তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। ধীরে ধীরে বলেন, 'ভেবেছিলুম, মৃত নবাবকে বুঝি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খোশবাগে—যেখানে নবাব আলিবর্দী খাঁর কবর রয়েছে। খোশবাগেই অবশ্য তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে—কিন্তু খোশবাগের পথে বাজারের কাছাকাছি আসতেই দুঃখে আমার সারা বুক হাহাকার করে উঠল। কী দেখলাম মিঞা সাহেব! হত্যা করেও তৃপ্তি পায়নি ওরা। নবাবের মৃতদেহ হাতির পিঠ থেকে তুলে আবর্জনার মতন ছুঁড়ে ফেলে দিল বাজারের চকের মধ্যে! দলা-পাকানো, অপমানিত মাংস-পিণ্ড! বলুন মিঞা-সাহেব, এ দৃশ্য দেখা যায়?...ঘেন্না ধরে গেল সংসারের ওপর, নিজের ওপর। ফকিরি নিয়েছি তারপর থেকেই।'

মামাও চুপ করে গিয়েছিলেন। কেউ আর কোনো কথা বলেন নি। ফকির-সাহেব আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলেন।

মেঘা রে, মামার কাছে এই কাহিনী শুনে আমিও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলুম ঘর থেকে। ক্রোধ, বুঝলি, ক্রোধের আগুন জ্বলছে আমার মনে। প্রতিশোধ চাই। আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি—'

মেঘনাদের মন ভার হয়ে উঠেছিল। সে গুম হয়ে রইল।

দলের ছেলেরা পিছিয়ে পড়েছিল। ওরা দুজনে আগে এসে পৌঁছোয়। মেলা বেশ জমে উঠেছে। গিজগিজ করছে লোক। এত লোকের মাঝে বাহন নিয়ে এগোন যায় না। মকবুল ও মেঘনাদ বাহন থেকে নামল। গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল বাহন দুটি। অপেক্ষা

করতে লাগল সঙ্গীদের জন্যে। ওদের আসতে দেরি হবে, ওরা হেঁটে আসছে।

দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মেলার চেহারা। আগে শূন্য মাঠ ছিল, এখন দোকান-হাটে ভরে গেছে। লোকে-লোকারণ্য। চারদিকে হইচই, চীৎকার, হট্টগোল। আনন্দের পাশাপাশি বিষাদের চিত্র। কোথাও নিরন্ন চাষী হালের বলদ নিয়ে দাঁড়িয়ে, যদি বিক্রি হয়। কোথাও বুভুক্ষু ছেলের হাত ধরে মা, যদি ভিক্ষা পাওয়া যায়। চোখে জল আসে। কষ্ট হয়। ওরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

দেখতে পায়, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোম্পানির লোক। তাদের মাথায় পাগড়ি, খাকি পোশাক, হাতে লাঠি। ভঙ্গি বেশ উদ্ধত। যেন গোটা মেলার মালিক ওরাই। ঘোড়ার চলার পথ পরিষ্কার রাখার জন্য মেলার লোকেদের গায়ে লাঠির খোঁচা দিচ্ছিল আর বলছিল, 'হট যাও—হট যাও—'

লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে সরে যাচ্ছিল আর সভয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছিল।

আর-এক শ্রেণীর লোক রয়েছে মেলায়। তাদের পোশাক সাদাসিধে। কারো পরনে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, কারো-বা মালকোচা ধুতি। কাঁধের কাছে বোতাম-আঁটা পিরান। কারো বা গেরুয়া পাগড়ি, কারো সাদা। কারো মাথায় আবার পাগড়ি নেই। কিন্তু প্রত্যেকের চেহারা সুগঠিত, বলিষ্ঠ। মেলার মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছেন যেন মেলার মানুষই।

মকবুল বলে, 'মেঘা, মেলায় এত সন্ন্যাসী কেন বল তো?'

'বোধহয় তীর্থ করতে এসেছে।' মেঘনাদ বলে।

'মেলায় আবার তীর্থ কিরে?'

'তাহলে মেলা দেখতে এসেছে—'

'দূর! তুই কিছু জানিস না।'

'তুই জানিস?'

'নাঃ।' মকবুল বলে, 'চারদিকে তাকিয়ে ভাখ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কত সন্ন্যাসী। মেলায় এত সন্ন্যাসী কেন বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভারী সুন্দর চেহারা সকলের—'

মেঘনাদ কী-যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়। ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সন্ন্যাসী-পুরুষ। তাঁর হাতে পাত্র-ভরা পানীয় জল, সাবধানে যাচ্ছিলেন লোকজনের গা বাঁচিয়ে। তিনি চোখ তুলে তাকালেন। হাসলেন মৃদু। মকবুল অপ্রস্তুত।

কিন্তু তাঁর এই সামান্য অন্যমনস্কতার ফলে ঘটে গেল অঘটন। সন্ন্যাসী-পুরুষের হাতের পাত্র ঠেকে যায় এক অশ্বারোহী ফৌজের গায়ে, চল্‌কে পড়ে জল।

তাঁর গায়ে জল!

'এই উল্লুক, দেখতে পাস না? আমার দামী পোশাক দিলি নষ্ট করে—'

সন্ন্যাসী-পুরুষ বলেন, 'অসাবধানে পড়ে গেছে। কিন্তু গালি দিলেন কেন?'

'বেশ করেছি। এবার থেকে চোখ চেয়ে পথ চলবি। যত-সব ভণ্ডের দল—' ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে গিয়ে সজোরে জুতোর ঠোক্কর লাগল সন্ন্যাসীর গায়ে। সন্ন্যাসী পতন সামলিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। ঘোড়া চিঁহি ডেকে উঠল।

মকবুল স্থির থাকতে না পেরে এগোতে যাচ্ছিল, মেঘনাদ তাকে থামালো। উত্তেজনা তার মধ্যেও, তবু সে বললে, 'মকবুল, যাস্‌নে, দাঁড়া। ভাখ-না কী হয়। আমরা তো আছি—'

'লাথি মারলে কেন?' সন্ন্যাসী তখনও ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন।

'লেগে গেছে। ও-রকম লেগে যায়। লাগাম ছেড়ে দে—'

'আমার হাতের জল ওইভাবে পড়েছিল, পড়ে যায়। কিন্তু তুমি এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন? তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে মানুষকে জুতো মারাই তোমার অভ্যাস। ক্ষমা চাও—'

চিঁহি।

'কিসের ক্ষমা ?'

'বুঝতে পারছো না ? নির্বোধ—'

'তুই আমার সময় নষ্ট করছিস, বেয়াদপ।'

'আবার রক্তচক্ষু ! ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে—'

'বেতমিজ, জানিস আমি কে ? কার সঙ্গে কথা বলছিস ?'

'জানি, তুমি ইংরেজ-কোম্পানির সৈনদলের ফৌজদার হাসান খাঁ। মেলায় এসেছো 'তোলা' নিতে। গরিব মানুষগুলো 'তোলা' দিতে না পারলে জোর করে আদায় করবে আর নিজের জেব-এ পুরবে—'

'তাতে তোর কী ?'

'কিছু না। আমরা তোমাদের 'তোলা' দেখতে এসেছি—'

'লাগাম ছেড়ে দে।'

'ক্ষমা চাও—'

'ফের। লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব।'

'দাও দেখি। পাল্‌টা লাথিতে তোমার মুখ ভেঙে যাবে।'

'বটে—'

চিঁহি।

ঘোড়াটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হাসান খাঁ ঘোড়ার ওপর থেকে ঘাড় উঁচু করে মেলার দিকে তাকাল। ডানহাত আন্দোলন করল। করতেই লাগল। তার কাছে এসে সমবেত হবার ইংগিত। ইতস্ততঃ ছড়ানো ফৌজীদল ইংগিত বুঝে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল।

সন্ন্যাসী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুকে ঝোলানো ছোট শিঙাটি তুলে জোরে ফুৎকার দিলেন। সমস্ত মেলায় ছড়িয়ে গেল সেই তীক্ষ্ণ ফুৎকার। বেজে ওঠে আরও শিঙা। মেলার মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রবল আলোড়ন। বোঝা যায় কোনো পক্ষই কম নয়। সন্ন্যাসী-দল এগিয়ে আসে দ্রুত। তাদের পোশাকের আড়ালে রয়েছে নানাবিধ অস্ত্র।

উত্তেজনায় থমথম করে মেলা-চত্বর। ভয়ে পড়ি-মরি করে সরে যায় অধিকাংশ লোক, কিছু থেকে যায় কৌতূহলে, কি হয় দেখার জন্য। মেঘনাদ ও মকবুলের চেলার দল এসে যায় এই সময়।

উত্তেজনা ওদের সকলের মধ্যে। ওরা দেখল, হাসান খাঁ উঁচু হাত নামিয়ে কাঁধ-বরাবর বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। অর্থাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ো। ফৌজীদল তো তাই চায়, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মেলাব চেহারা। অস্ত্রের ঝনঝনানি, চীৎকার, আর্তনাদ।

মকবুল দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'ভাই-সব, আমাদের আর চুপ করে থাকা চলে না। আমরা সব দেখেছি। ফৌজদার হাসান খাঁয়েরই অন্যায়। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব। তোমরা লড়াই চেয়েছিলে, আজ তার সুযোগ এসেছে। তোমরা হাতের কাছে যা পাও, লড়ে যাও। দেখি, তোমরা কি রকম শিক্ষা পেয়েছো—'

বলার অপেক্ষা মাত্র। পটাপট গাছের ডাল ভাঙা সুরু হয়ে যায়। জড়ো করা হয় পাথর আর ইটের টুকরো। তীর-ধনুক তো ছিলই।

ওদিকে তলোয়ারে-তলোয়ারে লড়াই আর এদিকে গাছের ডালের পিটুনি। পাথর আর ইট বর্ষণ। সাঁ-সাঁ করে ছুটে যায় তীর।

ফৌজীদলের অশ্ব ও আরোহীর আর্তনাদ শোনা যায় একযোগে। মেলাক্ষেত্র হয়ে যায় রণক্ষেত্র। ফৌজীদল ব্যস্ত হয়ে পড়ে আত্মরক্ষায়, বিচলিত হয় ফৌজদার হাসান খাঁ। এ কী হল! পিছু হটছে কেন ফৌজীদল? হাসান খাঁ তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে তলোয়ার ঘোরাতে-ঘোরাতে এগিয়ে চলল তাদের দিকে। শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করে সে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু কোথা থেকে কামানের গোলার মতন একখণ্ড পাথর এসে লাগল ঘোড়ার কপালে, যন্ত্রণায় চিঁহি করে ডেকে উঠল ঘোড়া, পা ছুঁড়ল। অনেক কষ্টে লাগাম টেনে ঘোড়াকে বাগে আনতে চেষ্টা করল হাসান খাঁ, কিন্তু বৃথা। আর-একটি পাথরের গোলা এসে লাগে ঘোড়ার মুখে। এবার আর সহ্য করতে পারল না ঘোড়া, থুবড়ে পড়ল মাটিতে। হাসান খাঁ লাফিয়ে নেমে ছিল আগেই, এক পলক তাকিয়ে দেখল যন্ত্রণা-কাতর বাহনটিকে, তারপর তাকাল যেদিক থেকে পাথর ছোঁড়া হয়েছিল। একদল কিশোর! কারো হাতে গাছের ডাল, কারো হাতে পাথর বা ইট। ওরাই তাহলে এই দুষ্কীর্তির নায়ক! ক্রোধে এগিয়ে যাচ্ছিল হাসান খাঁ।

এবার একখণ্ড ইট। দারুন জোরে এসে লাগল হাসান খাঁর মুঠোতে। আঙ্গুলের হাড়গুলো ঝনঝন করে উঠল যন্ত্রণায়। তার হাত থেকে খসে গেল তলোয়ার। বসে পড়ল মাটিতে।

আর তখনি তাকে ঘিরে ফেলল সন্ন্যাসী-দল। হাসান খাঁ বন্দী হয়ে গেল। তার সামনে এগিয়ে এলেন সেই সন্ন্যাসী-পুরুষ।

'ক্ষমা কিংবা শাস্তি', তিনি বললেন, 'এবার একটা বেছে নাও, হাসান খাঁ।'

হাসান খাঁ স্পষ্টস্বরে বললে, 'কোনোটাই না—'

'তুমি আমাদের বন্দী', তিনি গম্ভীর হয়ে ওঠেন, 'এখনও তেজ! হাসান খাঁ, এর পরিণাম জানো?'

হাসান খাঁ বলে, 'তোমরা যা-খুশি করতে পারো—'

'ঠিক আছে।' তিনি বলেন, 'শোনো, তোমরা এতদিন কয়েদখানায় পুরেছো আমাদের, নিরীহ দেশবাসীকে; এবার তুমি যাবে আমাদের কারাগারে, সন্ন্যাসী-কোটায়। ওকে নিয়ে যাও, সন্ন্যাসী-কোটায় বন্দী করে রাখো। দেখি, ক্ষমা চায় কিনা—'

ফৌজদার হাসান খাঁ-কে ঘোড়ার পিঠে তুলে, চোখ বেঁধে, সন্ন্যাসী-দল অদৃশ্য হয়ে যায়।

'সেদিন মেলা আর জমল না।

তিন

ফেরার পথে

মকবুল আর মেঘনাদ মহাখুশি। মনের মতন লড়াই করতে পেরেছে তারা। সত্যিকারের লড়াই। চেলারা নির্দেশ পালন করেছে যথাযথ। এতদিনের অস্ত্র শিক্ষা সার্থক হয়েছে। ঠিক মতন লড়েছে। প্রস্তুত হয়ে আসেনি বলে গাছের ডাল ভেঙে পিটেছে আর অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়েছে পাথর ও ইট। যারা মৃত ফৌজের তলোয়ার কুড়িয়ে পেয়েছে তারা লড়েছে মনের আনন্দে। সন্ন্যাসী-দলের লড়াই তো চমৎকার। ওদের হাতে তলোয়ার ছিল না, মোটা লাঠি শুধু। ওই লাঠি দিয়ে ওরা তলোয়ারের আঘাত রুখেছে আর পাল্‌টা আঘাত হেনেছে। এইভাবে আঘাত হেনে অনেকের হাত থেকে তলোয়ার খসিয়ে দিয়েছে আর সেই তলোয়ার নিয়ে তাদের খতম করেছে। অপূর্ব লড়াই। ওদের কাছে শেখার আছে অনেক-কিছু। ওরা শুকনো সন্ন্যাসী নয়।

এই রকম আলোচনা করতে করতে দুই বন্ধু চেলাদের নিয়ে ফেরার পথ ধরেছিল।

মকবুল এক সময় বলে, 'হ্যাঁরে মেঘা, সন্ন্যাসী-কোটা কোথায় বল্‌ তো?'

'কী জানি—'

'সেখানে কী আছে জানিস?'

'উহু—'

'তুই কিছুই জানিস না।' মকবুল বলে, 'আমার মনে হয় ওটা সন্ন্যাসীদের আস্তানা—তাই ওর নাম সন্ন্যাসী-কোটা। ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছে। ওদের একজন নেতা আছেন। তাঁর খুব নাম। মজনু সর্দার।'

'তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি—'

'কী শুনেছিস ?'

মেঘনাদ বলে, 'তাঁর প্রকৃত নাম মজনু শাহ। তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে বাস করেন। আগে নাকি বিহার ও অযোধ্যার সীমানায় মাখনপুর নামে এক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভীষণ ইংরেজ-বিদ্বেষী লোক আর অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতা। ক'বছর আগেই তো ১৭৭১ খ্রীঃ ফাল্গুনের মাঝামাঝি, মাত্র আড়াই হাজার সৈন্য নিয়ে মোকাবিলা করেছিলেন বিরাট ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে—'

'তাতে তিনি হেরে গিয়েছিলেন।' মকবুল বলে, 'কিন্তু ভেঙে পড়েননি। নতুন উদ্যোগে বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকেন আর নতুন লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আবার তাঁর দল গড়ে ওঠে। তিনি আক্রান্ত হয়েছেন বহুবার, কখনো জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন কখনো-বা অতর্কিতে পাল্টা আক্রমণে শত্রু সৈন্যদের তছনছ করে দিয়েছেন।'

মেঘনাদ বলে, 'তিনি পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ঘুরে বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। দল চালাতে গেলে অর্থ প্রয়োজন। এই অর্থ তিনি সংগ্রহ করতেন বগুড়া, ঢাকা ও ময়মনসিংহের বহু অঞ্চলের জমিদারের কাছে 'কর' আদায় করে। অনুচরদের ওপর তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল, তারা যেন জনসাধারণের ওপর কোনো-রকম জোর-জুলুম না করে, স্বেচ্ছায় কেউ কিছু দিল তো ভালো নইলে অন্য কারো কাছে যাবে—'

'আর একভাবে তিনি অর্থ-সংগ্রহ করেন।' মকবুল বলে, 'ইংরেজ-সরকারের কোষাগার বা কুঠি লুঠ করে। কখনও নিজে যান কখনও অনুচরদের পাঠান। এইভাবে তিনি দলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আজও।'

'তাঁকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে—'

'আমারও। কিন্তু আমি কী ভাবি জানিস ?'

'কী—'

'ভাবি, ওই রকম একজন নেতা আমাদের দরকার।'

'চল্, সন্ন্যাসী-কোটায় যাই একদিন—'

'যাওয়া তো যায়, কিন্তু আমাদের পাত্তা দেবে কেন?'

'তা ঠিক। আমরা যে বড্ড ছোট—'

মেঘনাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মকবুল একটু ভাবল। তারপর বললে, 'ছোট হলেও আমরা পাত্তা পেতে পারি। কেন জানিস? আমরা যে লড়তে পারি এটা প্রমাণ করতে পারলে আমাদের দিকে নজর পড়বে। তখন দলে নেবে। ওরা তো নতুন লোক চায়। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নতুন লোক সংগ্রহ করছে, দল বাড়াতে চাইছে, তাই না?'

'সব দলই তাই চায়।' মেঘনাদ বলে, 'কিন্তু এদিকে যে বেলা পড়ে এল—'

'সত্যি তো। ওদের ডাক দে। এগিয়ে যেতে বল্।'

সঙ্গী-সাথীরা এগিয়ে যায়। দুই বন্ধু পেছন-পেছন চলল বাহন দুটো নিয়ে। সবাই হাঁটছে।

'বড্ড দেরি হয়ে গেল।' মকবুল বলে, 'মামা আজ যা বকুনি দেবে—'

মেঘনাদ বলে, 'আমার বাবা আগে আমাকে পিটুনি দিত। এখন কিছু বলে না। আমি নাকি মানুষ হব না।'

'হ্যাঁরে, মানুষ হওয়া কাকে বলে?'

'কী জানি—'

'সত্যি, হাত-পা থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না। তাহলে মানুষ কারা?'

বেশ চিন্তিত মনে হল দুই বন্ধুকে।

'তোমরা, তোমরাই হচ্ছো মানুষ। সত্যিকারের মানুষ—'

চমকে যায় দুজনে। কে কথা বললে? মুখ ফিরিয়ে ছাখে,

ঠিক পেছনে অশ্বারোহী সেই সন্ন্যাসী-পুরুষ, যাকে কেন্দ্র করে খানিক আগে ঘটে গেছে তুমুল যুদ্ধ। তাঁর ঘোড়ার গতি মন্থর। ওদের কাছাকাছি এসে ঘোড়ার গতি আরও মন্থর হয়ে যায়।

সন্ন্যাসী-পুরুষ বলেন, 'মানুষেরই পরিচয় তোমরা দিয়েছো। তোমাদের কাছে এতখানি আশা করিনি, শাবাশ! নাও, ধরো—'

ওরা দেখল, সন্ন্যাসী-পুরুষ কিছু দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'কী ওটা?'

'ফুল—'

'কিসের ফুল?'

'মায়ের পুজার ফুল—'

'কে আমাদের মা?'

'দেশ-জননী—'

'আমরা, ছোটরাও, তাঁর সন্তান?'

'নিশ্চয়। মায়ের কাছে ছোট-বড় ভেদ নেই, সবাই সমান। তাছাড়া তোমরা ছোট একথা কে বলে? তোমরা অনেক বড়। এই ফুল গ্রহণ করো। শক্তি পাবে।'

ওরা হাত বাড়িয়ে ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করে। মাথায় ঠেকায়। মকবুল বলে, 'আপনি কী আমাদের লড়াই দেখেছেন?'

'বাঃ, দেখব না কেন?' তিনি বলেন, 'আমাকে নিয়ে এত কাণ্ড আর আমি দেখব না? আমি সব দেখেছি। এই তো চাই! এমনি করেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি, অনেক ছেলের সঙ্গে মিশেছি। দেখেছি, অনেক ছেলে এগিয়ে এসে তোমাদের মতন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে। তাদের বাহবা দিয়েছি। তোমাদেরও দিই। আজ এরকম সাহসী ছেলের খুব দরকার—'

মেঘনাদ বলে, 'আমরা কী পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে—'

মকবুল বলে, 'আমাদের মনে বড় জ্বালা।'

'এই জ্বালাই তোমাদের পথ দেখাবে—'

মকবুল বলে, 'আমরা কী সন্ন্যাসী-দলে যোগ দিতে পারি না?'

'অবশ্য পারো—'

'তাহলে আপনি আমাদের পথ দেখান।'

'পথ তোমরা ঠিক খুঁজে পাবে—'

'আমাদের একজন নেতা দরকার।'

'সময় হলে তা-ও পাবে—'

'অত্যাচার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে', মেঘনাদ বলে, 'সাধারণ মানুষ নিজেরাই-না নেতা হয়ে ওঠে।'

'যদি তা হয়, জেনো, সে হবে দেশের সুদিন।' তিনি বলেন, 'কিন্তু তার ঢের দেরি আছে। দেশের মানুষ এখনও অচেতন। তাদের জাগাতে হবে। সে বড় কঠিন কাজ—'

মেঘনাদ বলে, 'কিন্তু খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার যে বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। মানুষ অসহায়ভাবে এই অত্যাচার সহ্য করছে আর চোখের জল ফেলছে। ইংরেজ-সরকার দেশটাকে যেন হাড়ে-মজ্জায় শুষে নিতে চাইছে, ঝাঁঝরা করে ফেলছে মানুষগুলোকে।'

'তুমি ঠিক বলেছো ভাই।' তিনি বলেন, 'তবে অত্যাচার যতটা হয়েছে, এবার হবে তার চেয়ে বেশি। সেই লোক আসছে—'

'কে সেই লোক?'

'খাজনা আদায়ের জন্যে এবার আসছে দেবী সিংহ। তার প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর—'

'আমরা কিছু করতে পারি না?'

'হয়তো পারো।' তিনি বলেন, 'তবে মনে রেখো, দেবী সিংহ

লোকটি হাসান খাঁ নয়। তার শক্তি অসীম। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তার দহরম-মহরম—'

'ওয়ারেন হেস্টিংস কে?'

'তিনি ইংরেজ-সরকারের বড়কর্তা—গভর্ণর-জেনারেল—'

'দেশবাসীর দুর্গতি কী তিনি দেখছেন না?'

'কেন দেখবেন? এ দেশ তো তাদের নয়—'

'নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর থেকেই ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। এখন আমরা নিজদেশে পরবাসী। এ তো সহ্য হয় না। আমাদের একটা-কিছু করতে হবে।'

'এত অল্প শক্তি নিয়ে তোমরা কী-বা করতে পারো।' তিনি বলেন, 'এ-সব তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়। চারদিকে লক্ষ্য রাখো। নিজেরা আরও তৈরি হও—'

'ততদিনে আপনি আমাদের ভুলে যাবেন।'

'না ভাই, এত সহজে আমি ভুলি না। সব মনে রাখতে হয়। নইলে সর্দার হতে পারতুম না—'

মকবুল বলে, 'যদি দরকার হয়, আপনাকে কোথায় পাব?'

তিনি বলেন, 'সোজা চলে যেও সন্ন্যাসী-কোটায়। ঘোড়া ছোটালে আর কতক্ষণের পথ—'

'সেখানে গিয়ে কাকে খুঁজব?'

তিনি বলেন, 'ঠিক কথা। বোলো, সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাহলেই ওরা আমার কাছে নিয়ে যাবে। আমার নাম মজনু সর্দার—'

'আপনি মজনু সর্দার!'

'হ্যাঁ ভাই—'

মকবুল ও মেঘনাদের কণ্ঠে আর বাক্য সরে না। বিস্ময়ে হতবাক। সন্ন্যাসীদলের বিখ্যাত নেতা স্বয়ং মজনু সর্দার তাদের

পাশাপাশি চলেছেন, এত কথা বলেছেন, আশ্চর্য! স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এমন হতে পারে।

'চলি ভাই। তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক—'

মজনু সর্দার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন অন্যপথে।

ওরা তাকিয়ে রইল সেইদিকে। সর্দারের ঘোড়া যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর যাত্রা শুরু করল।

চার

মকবুল

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। দেবী সিংহ আসছেন সসৈন্যে। ছাউনি পড়বে গ্রামের মধ্যে। খাজনা আদায় করবে।

সেই দেবী সিংহ !

সংবাদটা শোনে ওরা দুজনে। ওদের মনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে—রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথাই বলতে পারে না।

'আমাদের গ্রামটা এবার ছারখার হবে।' মকবুল নিজের মনে বলে ওঠে।

'আমরা কী করতে পারি ?' মেঘনাদকে বেশ চিন্তিত দেখায়।

'মেঘা, কিছু তো করা উচিত—'

'বল্, কী করা যায় ?'

'ভাবছি।' মকবুল বলে, 'এক কাজ করলে হয়—'

'কী কাজ ?'

'দুটো ঘোড়া জোগাড় করতে হবে। পারবি ?'

মেঘনাদ বলে, 'অসম্ভব নয়। একটা তো আছেই—বাবার বন্ধুর ঘোড়া। চেষ্টা করলে আর-একটা হতেও পারে—'

'আন্ দেখি। আজ থেকেই তাহলে শুরু করি।'

'সন্ন্যাসী-কোটায় যাবি নাকি ?'

'না। গ্রামে-গ্রামে ঘুরব। ওদের মন থেকে ভয় দূর করতে হবে—'

'পারবি ?'

'পারতেই হবে—'

'বেশ।'

মেঘনাদ ছুটো ঘোড়া সংগ্রহ করে আনল। দুই বন্ধু চলল গ্রাম-পরিক্রমায়। হাটের মাঝে ঘোড়া থামিয়ে হাটের মানুষকে জানাল দেবী সিংহের আগমন-সংবাদ। জানাল, দেবী সিংহের প্রকৃতি এবং বোঝাল, দেশের অবস্থা। দেবী সিংহ আসছে বলে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা নয়, সাহস চাই। সাহসের সঙ্গে অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হবে। ভাই-সব, তোমাদের হাতেই আছে মরা আর বাঁচার অস্ত্র। মরার অস্ত্রে তোমরা আত্মহত্যা করতে পারো, যা এতকাল করে আসছো; কিন্তু বাঁচার অস্ত্রে তোমরা অনায়াসেই আত্মরক্ষা করতে পারো, যা কখনও করোনি। এই অস্ত্রটির নাম একতা, জোটবদ্ধ হওয়া, একযোগে রুখে দাঁড়ানো। যত বড় প্রতিপক্ষ হোক না-কেন, এই অস্ত্রের কাছে তাকে নতি স্বীকার করতেই হবে। ভাই সব, তোমরা এক হও, রুখে দাঁড়াও—

কৃষকদের অবস্থা সবচেয়ে সঙীন। তারা বারো মাস রোদে-জলে কঠোর পরিশ্রম করে মাঠে যে ফসল ফলায়, ফৌজদারের লোক এসে জবরদস্তি সে-ফসল তুলে নিয়ে যায়। শূন্য মাঠের দিকে তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে আর চোখের জল ফেলে। এই তাদের ভাগ্য। তারা প্রতিবাদের সাহস পায়নি—খোদা বা ভগবানের কাছে অক্ষম নালিশ জানিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থেকেছে।

মকবুল তাদের বলেছে: 'এতকাল তো এইভাবে কেটেছে। এইবার শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াও। হাতের কাস্তে শান দিয়ে রাখো—'

শিউরে উঠেছে ওদের গা, চমকে গেছে মন। এমন কথা কেউ তো তাদের বলেনি। তিলে তিলে মরার চেয়ে একেবারে মরাই তো ভালো। লড়াই করে মরতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের ঘোলাটে চোখগুলো নতুন দীপ্তি পায়। লাঙল চেপে ধরে শক্ত হাতে।

উৎসাহ পায় দুই বন্ধু। তারা আর স্থির থাকে না। উত্তেজনার তরঙ্গে ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে যায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। তাদের ঘোড়া দুটো ছুটে বেড়ায় সব জায়গায়।

মকবুলের কথাগুলো ঠিক গোছানো নয়। তবে প্রতিদিন বলার দরুন একটা বক্তৃতার ঢঙ এসে গিয়েছিল। সে ঘোড়ার পিঠে চড়েই আবেগে-উত্তেজনায় বলত:

'ভাইসব, আজ আমরা এক বিপদের মুখোমুখি। খাজনা আদায়ের নামে শিগগির আসছে এক অত্যাচারীর দল। মন্বন্তরের কালোছায়া মিলিয়ে যেতে না-যেতেই চারদিকে দেখা দিয়েছে খাজনা-আদায়ের জুলুম। শ্মশান হয়ে যাচ্ছে এক-একটা গ্রাম। একদিন যারা বেনিয়া হয়ে এসেছিল এ-দেশে, আজ তারাই আমাদের শাসন করছে, শোষণ করছে। ভাই-সব, বলো, আমরা কী এই শাসন-শোষণ মানব?'

'না। কখনই না—'

জনতার চিৎকার ওঠে।

'বলো কী করতে হবে?'

তরুণ-সম্প্রদায় এগিয়ে আসে।

'এ-সব আমাদেরই কথা। খাঁটি কথা।' প্রবীণেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'কিন্তু ওরা তো ছেলেমানুষ। ওদের কতটুকু শক্তি। ওদের কথায় নাচলে ··'

মকবুল শুনতে পায় ওদের কথা। সে বলে, 'আমরা ছোট, আমাদের শক্তি কম, আমরা তা জানি, আর সে-জন্যেই এসেছি আপনাদের কাছে। আপনারা আমাদের পরামর্শ দিন, পথ দেখান, আজ দেশের বড় দুর্দিন।'

প্রবীণরা বলে, 'আমরাও আছি তোমাদের সঙ্গে—'

তার টাট্টু ছোটে আবার। সকলকে বোঝায়। উদ্বুদ্ধ করে। সাহস জোগায়।

বাংলা দেশের লাঙল-ধরা কড়া-পড়া কৃষকদের হাতে উঠে আসে ধারালো দা, কুড়ুল, তলোয়ার, বল্লম। ঘরে ঘরে ওড়ে গৈরিক পতাকা—সন্ন্যাসী-দলের প্রতীক। সেদিন উত্তরবঙ্গের দিকে-দিকে জেগে ওঠে অসংখ্য স্বেচ্ছাসৈন্য। এখন শুধু আদেশের প্রতীক্ষা।

ঠিক সেই সময় শোনা গেল, ওই গ্রামেই পড়েছে দেবী সিংহের দলের ছাউনি।

পাঁচ

দেবী সিংহের পরিচয়

কোম্পানির কোপে পড়ে মহম্মদ রেজা খাঁর চাকরি গেছে তখন। সেই শূন্য পদটির দিকে ছিল দেবী সিংহের লোলুপ দৃষ্টি। পেতে হবে ওই চাকরি।

বাংলার গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে দেবী সিংহের বিশেষ দেরি হয়নি—সে জানত মূল খুঁটি ওইখানে বাঁধা। সেজন্যে অবশ্য কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল প্রচুর। যতবার দেখা করতে গেছে ততবার দিয়েছে রাশি-রাশি উপঢৌকন। তাতে কে-না খুশি হয়!

দেবী সিংহের জন্ম বাংলাদেশ থেকে বেশ দূরে—পানিপথে। জাতিতে আগরওয়ালা বৈশ্য। তার পূর্বপুরুষদের জীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু অধস্তন দেবী সিংহের উচ্চাশা ছিল আরও বেশি। পানিপথের মতন ছোট জায়গায় তার বিকাশ ঘটছিল না। সে বেরিয়ে পড়েছিল বড় জায়গার সন্ধানে।

মুর্শিদাবাদ তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সেরা কেন্দ্র। এমন কি, বাদশাহ যেখানে বাস করতেন সেই আগ্রা-দিল্লীর সঙ্গেও পাল্লা দিত মুর্শিদাবাদ। দেবী সিংহকে টানল এই জায়গা। এখানে এসে বুঝল, এই সেই স্বর্ণভূমি যার সন্ধান সে এতকাল করছিল।

কিন্তু কোম্পানির দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর তখন দারুণ রবরবা—তাকে ডিঙিয়ে কিচ্ছুটি করার উপায় নেই। রেজা খাঁর ওপর কোম্পানি অনেকখানি নির্ভর করে থাকত। কোম্পানির অর্থের চাহিদা বেশির ভাগ মেটাত দেওয়ান রেজা খাঁ। দেবী সিংহ তা বুঝেছিল। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে সে চায়নি। কিন্তু রেজা খাঁ বড় শক্ত ঠাঁই। সহজে সে কাউকে পাত্তা দেয় না।

দেবী সিংহ জানত, ধৈর্য ধরতে এবং প্রতীক্ষা করতে পারলে সুযোগ একদিন আসবেই।

সুযোগ অবশ্য এল। ধৈর্য আর প্রতীক্ষার হাত ধরে সুযোগ এল ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। তার ভাগ্যের ক্ষেত্রে সময়টি ছিল অনুকূল। বাংলার ইতিহাসে সে এক সন্ধিক্ষণ। মুসলিম-রাজত্বের অবসান আর ইংরেজ-রাজত্বের সূত্রপাত। দেশ-শাসনের নামে চলেছে তাদের শোষণ আর অত্যাচার।

কোম্পানি নামমাত্র মূল্যে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেছে আর এই তিন প্রদেশের নবাব নজমউদ্দৌলাকে করে রেখেছে শক্তিহীন। নবাব তাদের বৃত্তিভোগী। তাঁর কোনো ক্ষমতাই ছিল না। ইংরেজদের বুদ্ধি আর দাপট ছিল প্রচণ্ড।

ইংরেজরা রাজস্ব-আদায়ের এই সুবর্ণ-সুযোগ ব্যর্থ হতে দিল না। মোক্ষণ করলেই যখন অর্থ, তখন তা করবে না কেন? বঙ্গদেশ তো স্বর্ণভূমি! মোক্ষণ করে যেতে হবে—তা সে যেভাবে হোক। নিজেরা এ-কাজ করলে বদনাম হতে পারে, অতএব তারা যোগ্য লোকের সন্ধান করতে থাকে। তাদেব নজরে পড়ে যায় মহম্মদ রেজা খাঁ। লোকটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি পদলেহী। তাকে দিয়ে কাজ হবে। রেজা খাঁকে করে দেওয়া হল উত্তরবঙ্গের নায়েব-দেওয়ান।

উত্তরবঙ্গ অনেক বড় এলাকা। একা রেজা খাঁর পক্ষে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাকে নির্ভর করতে হচ্ছিল অনুগত কর্মচারীদের ওপর।

দেবী সিংহ স্থির করল, এই ছিদ্রপথে তাকে প্রবেশ করতে হবে।

সে উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হল রেজা খাঁর কাছে।

রেজা খাঁ সেদিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

দেবী সিংহ থতমত খেয়ে যায়: 'আজ্ঞে—'

'বলি, কী জন্যে এসেছো ?'

'আজ্ঞে আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনার অধীনে যদি একটা চাকরি পাই —'

'চাকরি ! সে আমি কোথায় পাব ?'

'মানে শুনেছিলাম—'

দেবী সিংহ হাত কচলাতে থাকে।

'এখন চাকরি নেই। পরে আসতে পারো—'

পরে আসতে পারো। এ কিসের ইঙ্গিত ? আশা-নিরাশায় দুলতে থাকে দেবী সিংহের মন। সাধারণত পদক্ষেপ ভুল হয় না তার। তবু ভুল হয়েছে কোথাও। উনি ভুরু কোঁচকালেন কেন ? সামান্য উপঢৌকন কী পছন্দ হয়নি ? হয়তো তাই। এবারে যেতে হবে বড় গোছের নজরানা নিয়ে।

রতনে রতন চিনেছিল ঠিকই।

রেজা খাঁ তখন বেজায় বিপাকে পড়েছে। কোম্পানির অর্থক্ষুধা মেটাতে গিয়ে সে বেশ নাজেহাল। ওপরওয়ালাদের চাপে পড়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শুধু টাকা-টাকা-টাকা। এত টাকার যোগান সে দেবে কী করে ? দোহনে-দোহনে ছিবড়ে হয়ে উঠেছে এ-দেশের মানুষগুলো। এখন তাদের নিঙড়ালেও এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে না। অথচ এই টাকা চাই আজ সন্ধ্যার মধ্যে। রেজা খাঁ অস্থির হয়ে উঠেছিল।

'হুজুর—'

সেই সময়ে দেবী সিংহের আবার প্রবেশ।

'কী চাই ?'

রেজা খাঁ তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'হুজুরের সেবায় সামান্য প্রণামী এনেছিলাম। দয়া করে গ্রহণ করুন। কৃতার্থ হব।'

দেবী সিংহ তার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে একটি টাকার তোড়া।

'কত আছে ?'

দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল রেজা খাঁর।

'আজ্ঞে হাজার পঁচিশ হবে—'

ভিতরের চাঞ্চল্য দমন করতে পারে না রেজা খাঁ। যে লোক নিজের ইচ্ছায় পঁচিশ হাজার টাকা প্রণামী দিতে আসে তার উদ্দেশ্য যাই হোক, চাপ দিলে হয়তো আরও বেশি টাকা পাওয়া যাবে।

'তুমি আরও কিছু টাকা দিতে পারো ?'

'কত ?'

'এক লাখ—'

'কবে দরকার ?'

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে—'

'আপনি নিজের মুখে যখন চাইছেন,' দেবী সিংহকে ঝুঁকি নিতেই হয় : 'চেষ্টা করে দেখি। হুজুর, এখন তবে আসি।'

'এসো—'

দেবী সিংহ সন্ধ্যার আগেই টাকা এনে দেয়। তার চোরাই

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল নানা নামে, সেখান থেকে তুলল অনেকখানি। বাকিটা দেনা করে।

ঝুঁকি তাকে নিতে হয়েছে এবং এই ঝুঁকির পুরস্কার সে পেল অচিরে। তাকে দেওয়া হল পুর্ণিয়ার ইজারা ও শাসনভার।

শাসনভারের দায়িত্ব পাওয়ার পর দেবী সিংহ দেখা দেয় নিজের মূর্তিতে। লাখ টাকার মূলধন তুলতে হবে—বাড়াতে হবে জমানোর জন্যে টাকা। ক্ষমতা যখন পাওয়া গেছে তখন তা ব্যবহার করা উচিত। পুর্ণিয়ার জমিদাররা ও প্রজারা তার পরিচয় পেল কিছুদিন যেতেই। অর্থ না দিলে অত্যাচার। নানা রকম শোষণ ও পীড়ন চলে অবাধে। পুর্ণিয়া শ্মশানে পরিণত হয়।

ইংরেজ-কর্তৃপক্ষের কানে ওঠে এ-সব কথা। দেবী সিংহকে বরখাস্ত করার জন্যে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে আবেদন আসে। তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। হেস্টিংস পড়ে যান ফাঁপরে। দেবী সিংহ তাঁর প্রিয়পাত্র অথচ তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো গুরুতর। সামলানো যায় কী করে? হেস্টিংস তাকে পদচ্যুত করলেন, কিন্তু পাইয়ে দিলেন অন্য একটি চাকরি। পাঠিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদে—সেখানকার প্রাদেশিক সমিতির সহকারী কর্মাধ্যক্ষ করে।

'মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতি'র উঁচু পদে হেস্টিংস বেছে-বেছে এমন কিছু ইংরেজকে নিযুক্ত করেন যারা নতুন এদেশে এসেছে, যাদের বুদ্ধি কম আর বয়স অল্প। ফলে দেবী সিংহ হয় সমিতির সর্বেসর্বা। সে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে ওই ক'জন তরল-মতি ইংরেজ যুবককে সব সময় বশে রাখত নানান আমোদে-প্রমোদে। তারা খুশি থাকত এবং দেবী সিংহের প্রশংসা করত। ফলে, দেবী সিংহ অবাধ হয়ে ওঠে। তখনই সে স্বনামে ও বেনামে বহু জমিদারীর ইজারা নেয়। বেড়ে ওঠে লোভ। ভাবল, প্রতিবার রাশি-রাশি টাকা রাজস্ব পাঠাবার কোনো মানে হয়?

অতএব···।

'প্রাদেশিক সমিতির' উঁচু মহলের সদস্যরা নেশার ঘোর সত্ত্বেও যেটুকু দেখতে পেলেন তাতে তাঁদের চক্ষু স্থির। এ কী! এ যে ডাহা পুকুর-চুরি! বিপুল অর্থের তছরুপ। রাজস্বের মোটা অংশ যাচ্ছে সিংহ-মামার পেটে! এ হতে পারে না। তাঁরা অভিযোগ পাঠালেন দেবী সিংহের নামে।

দেবী সিংহ বলে, 'মহাশয়গণ, আপনারা জানেন না, আপনারা কী করছেন, ঈশ্বর আপনাদের ক্ষমা করুন···'

দেবী সিংহ জানত, কে তাকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে। সুতরাং সে হাজির হল হেস্টিংসের দরবারে। বিরাট এক তোড়া নামিয়ে রাখল তাঁর পায়ের কাছে—বিপুল অর্থ। হেস্টিংস মৃদু হেসে বলেন, 'এখন যাও। দেখি কী করতে পারি।'

হেস্টিংসের পক্ষে যা করা সম্ভব তা-ই তিনি করলেন। ক্ষমতা তাঁর হাতে, সেই ক্ষমতার জোরে তিনি ভেঙে দিলেন 'মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতি'। আর 'সমিতি' যখন ভেঙে গেল তখন অভিযোগের মূল্য আর রইল না। বিচার তো হলই না, বরং প্রশ্রয় পেয়ে দেবী সিংহের বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে উঠল বিস্তৃত। দেবী সিংহকে দেওয়া হল দিনাজপুর, ইদ্রাকপুর প্রভৃতি লাভজনক জায়গাগুলির ইজারা। এই সময় সে পায় আরও একটি জায়গার ইজারা—রংপুর।

নতুন ইজারা পেয়ে সব জায়গাতেই, রংপুরেও, নতুন করে পীড়ন শুরু করল দেবী সিংহ। রেজা খাঁর চাকরি গেছে—এখন তার পদটি দেবী সিংহের দখলে। দেবী সিংহ জানে, টাকা পেলেই হেস্টিংস খুশি, তাঁকে নিয়মিত টাকা জুগিয়ে যেতে হবে। এত টাকা আসবে কীভাবে? তার কাছে উপায় ছিল খুব সোজা। খাজনা বাড়ানো—দ্বিগুণ, চতুর্গুণ! ফলে, নাভিশ্বাস উঠল জমিদার ও প্রজাদের। সাংঘাতিক জুলুম!

'খাজনা দিতে না পারো', দেবী সিংহ নিস্পৃহ স্বরে বলে, 'মুচলেকা লিখে দাও। যাদের জমি-জায়গা বাড়ি-ঘর আছে তারা সব লিখে

দাও, আর যাদের জমি-জায়গা নেই তাদের একখানা ঘর তো আছে…’

মুচলেকা লিখে দিতে বাধ্য হয়েছে অনেকে। কিন্তু যারা দেয়নি—দেবী সিংহের পাইক তাদের ধরে নিয়ে গেছে কাছারিতে। সেখানে পীড়ন চলেছে নানা প্রকার। আঙ্গুলে শক্ত দড়ি বেঁধে পাক দিয়েছে ক্রমাগত—বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আঙ্গুলের সংযোগস্থল। কারো কারো আঙ্গুলের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে হাতুড়ির আঘাতে। বন্দীদের জোড়ায়-জোড়ায় শিকলে বেঁধেছে, তাদের পা ওপর দিকে আর মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এগুলো ছিল সাধারণ পীড়ন। মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রেখে ক্রমাগত বেত মেরেছে আর হাত-পায়ের আঙ্গুল থেকে নখ ছিঁড়ে নেওয়াই ছিল তার প্রিয় শাস্তি। বেত আর লাঠির ব্যবহার ছিল আকছার। তাতেও মনের মতন পীড়ন হচ্ছে না বলে দেবী সিংহ আদেশ দিত : ‘বেলগাছের ডাল নেই ? বিছুটি ?’

তাছাড়া, শীতকালে বন্দীদের সারারাত খালি-গায়ে পুকুরের ঠাণ্ডা জলে গলা অবধি ডুবিয়ে রাখাই ছিল তার এক নির্দেশ।

পীড়নের নানা উদ্ভাবনী শক্তি ছিল দেবী সিংহের। মানী ব্যক্তিদের ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়ে গ্রাম-ঘোরানো তার মধ্যে একটি। বাবার সামনে নাবালক ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেত মারা আর বাবার হাহাকার শোনা ও মূর্ছিত হয়ে পড়া—দেবী সিংহকে প্রচুর আনন্দ দিত। কখনও-কখনও বাবা-ছেলেকে একসঙ্গে বেঁধে বেত মারার দৃশ্য দেখা তার তৃপ্তির কারণ হতো।

এক-সন যেতে না-যেতেই আর এক-সন আসত। পীড়ন ও জুলুম ফিরে আসত আবার। গ্রামবাসীরা ভয়ে আধ-মরা হয়ে থাকত।

ছয়

দেবী সিংহের প্রতিনিধি

কিন্তু অঘটন ঘটল।

দেবী সিংহের অধীনে কাজ করত বেশ-কিছু প্রতিনিধি। নিজের পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয় না বলে এই-সব লোকেদের যেতে হতো তার নির্দেশ মতন। এরা দেবী সিংহের মনের মতন লোক। কেউ-কেউ আবার গুরুকেও ছাড়িয়ে যায়। সেই-রকম একজন লোক—কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী।

এ-অঞ্চলে দেবী সিংহেরই আসবার কথা ছিল। কিন্তু এক বৃহৎ জমিদারি আত্মসাৎ করার মহৎ কাজে তাকে চলে যেতে হয়েছে দিনাজপুর। দেবী সিংহের নির্দেশে এ গ্রামে তাই এসেছে কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী।

লোকটিকে দেখতে যেমন মোটা তেমনি কালো, নামের সঙ্গে মিল আছে। দেখতে বিচ্ছিরি। গোরুর মতন গল-কম্বল, কানের নিচে প্রকাণ্ড জড়ুল। সারা গায়ে বড়ো-বড়ো লোম। বন-মানুষের মতন দেখতে। গলার স্বর তেমনি, কর্কশ।

গ্রামে ছাউনি পড়েছে। বোশেখ মাস। দারুন গরম।

বাইরে, ছাউনির ছায়ায়, একখানি কাঠের কেদারায় মোটা-শরীরে কোনোমতে বসে আছেন কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী। নড়তে পারেন না, খাপে-খাপে শরীর বসে গেছে। তাই মাঝে মাঝে তার চিৎকার শোনা যায়: 'এই উল্লুক, জোরে, আরও জোরে হাওয়া করতে পারিস না? নড়া বেতিয়ে গেছে নাকি? খাসনি কিছু?'

ছুজন পাইক ছুপাশে দাঁড়িয়ে, হাতে তালপাতার মস্ত পাখা, বাতাস করছে প্রাণপণে। ধমক খেয়ে পাখায়-পাখায় ঠোকাঠুকি লেগে যায়। কৃষ্ণপ্রসাদ খিঁচিয়ে ওঠে: 'ভালো করে দাঁড়াতে শিখলি না এখনও? তোদের ছুটোরই চাকরি খেতে হবে। অপদার্থ!'

বৈশাখ মাসের ছুপুর। আকাশের দিকে তাকানো যায় না। আগুন ছড়াচ্ছে যেন। পাখি নেই একটিও, কুকুর ধুঁকছে গাছের তলায়। মাঝে মাঝে কুঁই কুঁই করে উঠছে মানুষের ছুঃখ দেখে, কখনও ঘেউ ঘেউ। চমকে উঠছে বারে বারে। তাদের চোখের সামনে এ-সব কী হচ্ছে!

কৃষ্ণপ্রসাদ ছাউনির ছায়ায় বসে টানা-পাখার বাতাস খেতে-খেতে পরম রমণীয় কিছু দৃশ্য উপভোগ করছেন!

তার নির্দেশে বন্দী করে আনা হয়েছে চাষী-সম্প্রদায়ের কিছু লোককে। তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ফাঁকা জায়গায় রোদে, খালি গায়ে। কৃষ্ণপ্রসাদের আদেশে তাদের বেত মারা হচ্ছে। বাতাসে শব্দ উঠছে ছপাত ছপাত আর শোনা যাচ্ছে করুণ আর্তনাদ। নাক দিয়ে কারো বেরিয়ে এসেছে রক্ত, কারো মুখ হয়ে উঠেছে বীভৎস। পায়ে ভর্ দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না কেউই।

'জল—আমাকে একটু জল—' তাদের মধ্যে একজন প্রার্থনা জানায়।

কৃষ্ণপ্রসাদ হেসে ওঠে। বলে, 'ওরে, ওকে জল খাইয়ে দে।

ভালো করে খাওয়াস।···হাওয়া কর্, এই উল্লুক, জোরে হাওয়া কর্।'

এরা হাওয়া করতে থাকে আর একজন পাইক পাত্র-ভরা জল নিয়ে আসে।

'কি করে খাওয়াতে হয় জানিস তো?'

পাইক ঘাড় নাড়ে আর কেদারায় জেঁকে বসে কৃষ্ণপ্রসাদ। মড় মড় করে ওঠে কাঠের কেদারা।

'যত্ত সব···। ছোট কেদারায় কেন-যে আমাকে বসতে দিস। ওদের চেয়ে আমার বেশি কষ্ট—'

পাইক বলে, 'হুজুর, এর চেয়ে বড়ো কেদারা ছিল না যে!'

'বাজে বকিস না।' কৃষ্ণপ্রসাদ বলে, 'নে, ওকে জল খাওয়া দিকিন। দেখি কেমন পারিস—'

পাইক জানে কি করে জল খাওয়াতে হয়। তাকে এ-কাজ বহুবার করতে হয়েছে। কাজটি মোটেই কঠিন নয়। হাত-পা বাঁধা বন্দী জলপানের জন্যে ঝুঁকে পড়লে জলের পাত্রটি শুধু সরিয়ে নেওয়া। তাই হয়।

ঘামে-ভেজা শরীর, রক্তে-ভেজা ঠোঁট, কণ্ঠ-ভরা পিপাসা—বন্দী যে-মুহূর্তে জলের পাত্রের ওপর ঝোঁকে সেই মুহূর্তে পাত্র সরিয়ে নেয় পাইক। আবার এগিয়ে দেয়, আবার সরিয়ে নেয়। নাগালের মধ্যে বাড়ায় আর সরিয়ে নেয়।

'বা, বেশ হচ্ছে। হ্যাঁ ওইভাবে—'

উপভোগ করছেন দেবী সিংহের যোগ্য প্রতিনিধি কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী।

বন্দীর হাত-পা বাঁধা, তবু সে অন্তিম পিপাসায় আর-একবার পাত্রটির ওপর ঝুঁকতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে। তার মুখের কাছ থেকে একটু দূরে শুকনো মাটিতে জলের পাত্রটি উবুড় করে দেয় পাইক। বন্দী বুক ঘষতে-ঘষতে সেই জল পান করতে গেলে

কৃষ্ণপ্রসাদের ইংগিতে পাইক পা দিয়ে ঘষে কাদা করে দেয় জায়গাটা। হতভাগ্য বন্দী মুখ আর তুলতে পারল না, পড়ে রইল সেইভাবে, নিথর।

'আর কে জল খাবে? তেষ্টা পায়নি? যা, বাল্‌তি ভর্তি করে জল এনে রাখ্‌ ওদের সামনে। জল খেতে চাইলেই···হাঃ হাঃ হাঃ···'

ওর হাসির সঙ্গে তাল রেখে শোনা গেল খট-খট-খট-খট শব্দ। চমকে উঠল কৃষ্ণপ্রসাদ। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। রুক্ষ জমিতে খটাখট শব্দ, মাঠ ডিঙিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। খুব কাছে এসে পড়েছে। শোনা যায় তাদের কণ্ঠের রবঃ 'হর হর বোম বোম—'

চারদিকে সচকিত করে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠের ধ্বনি।

প্রহরী ছুটে আসেঃ 'হুজুর, সর্বনাশ! এ নিশ্চয় সন্ন্যাসীদল—'

'সন্ন্যাসীদল! কারা তারা?'

'আজ্ঞে ওরাই তো উৎপাত করে বেড়াচ্ছে। মোগলহাটের মেলায় ওরাই তো সেদিন—'

প্রহরী ভয়ে কাঁপছিল।

'বটে।' কৃষ্ণপ্রসাদ গর্জন করে ওঠেঃ 'আমার বন্দুক লে আও —জল্‌দি—'

কিন্তু বন্দুক চালাবার সুযোগ পেল না কৃষ্ণপ্রসাদ। দ্রুত ছাউনি ঘিরে ফেলেছে অশ্বারোহী বাহিনী। আর নির্ভুল লক্ষ্যে বর্শা ছুঁড়ে দিয়েছে মকবুল। বর্শা বিঁধল কৃষ্ণপ্রসাদের পিঠে। কেদারা-সুদ্ধ কেঁপে উঠল কৃষ্ণপ্রসাদ। যন্ত্রণায় কাত্‌রাতে থাকে আর চিৎকার করেঃ 'বন্দুক, আমার বন্দুক—'

আবার বর্শা। এবার ওর বুক লক্ষ্য করে সামনাসামনি।

'আঃ—'

কৃষ্ণপ্রসাদ কেদারা-সমেত উল্‌টে যায়, মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে।

যেমন পড়েছিল পিপাসার্ত বন্দীটি। এক লহমায় সমস্ত লণ্ডভণ্ড। ছাউনি ছেড়ে পালায় ফৌজিদল। প্রহরী বেচারী কাঁপছিল। তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে ওরা। বেষ্টনীর মধ্যে যারা ঘেরাও হয়েছিল তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে। বুঝি প্রাণ যায়!

'তোমরা যেতে পারো।'

পড়ি-মরি করে ছুটে পালায় কৃষ্ণপ্রসাদের অবশিষ্ট লোক।

অশ্বারোহী বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে মকবুল আর মেঘনাদ। ছাউনি শূন্য হয়ে গেছে। কেউ নেই। ছাউনির সামনে শুধু চিৎ হয়ে পড়ে আছে কৃষ্ণপ্রসাদ, বুকে বর্শা বেঁধা।

বন্দীরা বিস্ময়ে এই আজব কাণ্ড-কারখানা দেখছিল।

মকবুল বলে, 'ওদের মুক্ত করে দাও—'

মাঠ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। বাহিনী ফিরে চলল জয়ধ্বনি দিতে-দিতে।

ছয়

সন্ন্যাসী-কোটা

উত্তরবঙ্গের উত্তর প্রান্তে জলপাইগুড়ির একেবারে শেষ-সীমায় সন্ন্যাসীদলের অধিনায়ক মজনু সর্দারের বিচিত্র দুর্গ—সন্ন্যাসী-কোটা। তাঁর জোরদার নেতৃত্বে দল ভারী হয়েছে দিনে দিনে। সকলে একসঙ্গে মেলবার জন্যে একটা দুর্গের প্রয়োজন ছিল। সেদিক থেকে এই স্থানটি হয়েছে উপযুক্ত। কাছে নদী আর তিনদিকে জঙ্গল, সামনে গড়খাই। হঠাৎ কেউ আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে। বেশ ভেবে-চিন্তেই এই কোট বা দুর্গ করা।

ফৌজদার হাসান খাঁকে এইখানে এনে রাখা হয়েছে। হাসান খাঁ ভেবেছিল তার বন্দীত্বের সংবাদে স্বয়ং দেবী সিংহ আসবে তাকে উদ্ধার করতে। তাকে উদ্ধার করবে আর এদের শায়েস্তা করবে। দেবী সিংহ আসেনি। কেউই আসেনি। যত দিন যায় হাসান খাঁ তত হতাশ হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে তার উদ্ধারের আশা কম। অথচ অসহ্য হয়ে উঠেছে এই বন্দীত্ব। এখানকার পরিবেশ ও খাদ্য রুচিকর নয়। পরিবেশ থমথমে আর খাদ্য নিরামিষ। তার স্বাস্থ্য ও মনোবল ভেঙে পড়ছিল। এরা মুক্তি দিতে পারে যদি ক্ষমা চাওয়া যায়। ক্ষমা! সে অসম্ভব। তার মান-সম্মান নেই?

হুঁ, মান-সম্মান! আচ্ছা, ওটা আপাতত স্থগিত রাখা যায় না? কিল খেয়ে তো অনেকে কিল চুরি করে। যদি এখান থেকে বেরুনো যায় তাহলে পরে এই অপমানের শোধ তোলা যেতে পারে। এই উচ্চিংড়েগুলোর জ্বালাতন আর সহ্য হয় না।

'এই-যে সর্দারজি—'

মজনু সর্দার যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, থেমে গেলেন।

'বলুন?'

'কারাগারের দরজাটা খুলে দিতে আজ্ঞা করুন। আমি মাপ চাইছি—'

মজনু সর্দার বলেন, 'এভাবে হবে না। দলের সকলের সামনে মাপ চাইতে হবে।'

'বেশ। তাদের ডাকুন—'

মজনু সর্দারের ইংগিতে প্রহরী দরজা খুলে দেয়। হাসান খাঁ বেরিয়ে আসে। সকলের সামনে সে ক্ষমা চায়।

সর্দার বলেন, 'এবার ওকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। ওর চোখে পট্টি বেঁধে সীমানা পার করে দাও—'

তাই হয়। ওর চোখে পট্টি বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চড়ানো হল। এক সৈনিক তার পেছনে বসে লাগাম ধরল। ঘোড়া ছুটল।

মজনু সর্দার এবার তাকালেন মকবুলের দিকে।

বললেন, 'তোমাদের গ্রামের খবর কী?'

মকবুল বলে, 'দেবী সিংহের অনুচর কৃষ্ণপ্রসাদ গিয়েছিল আমাদের গ্রামে—'

'জানি। তোমরা তাকে উচিত সাজা দিয়েছো। সাবধানে থেকো।'

'সর্দারজি, আমাদের গ্রামের লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—'

'কারণ?'

'আজ্ঞে তারা আপনার দর্শন চায় আর দলে যোগদান করতে চায়—'

'তাদের আসতে বলো।'

মকবুল তাদের ডেকে আনতে বাইরে চলে যায়।

মেঘনাদ বলে, 'সর্দারজি, খবর পাওয়া গেছে দেবী সিংহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্যে গোরা-সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছে—'

'বটে!' সর্দার বলেন, 'মেঘনাদ, আমাদের দল আরও জোরদার

করতে হবে। আমি সকলকে গেরিলা-যুদ্ধের শিক্ষা দেব। যারা নতুন ভর্তি হচ্ছে তারাও সেই শিক্ষা পাবে।'

মকবুলের সঙ্গে ঢুকল বহু লোক।

মকবুলের সঙ্গে যারা এল তারা সবাই সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা নেয়।

সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা নিতে হলে প্রতিজ্ঞা করতে হতো যে—

ক. নিজের দেশ মুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত মাটিতে শয়ন করব।

খ. কলাপাতায় আহার করব।

গ. বুকের রক্ত দিয়ে দেশমাতার সেবা করব।

ঘ. বিলাসিতা করব না।

নতুন-আসা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল।

মজনু সর্দার তারপর সকলকে নিয়ে বসলেন আলোচনা-সভায়। আলোচনার বিষয় হল ঃ অর্থ-সংগ্রহ। কিভাবে এই অর্থ-সংগ্রহ করা যায় তা নিয়ে নানা প্রস্তাব ওঠে। অন্যতম নেতা মহেশ্বরজী প্রস্তাব করেন ঃ ইংরেজদের কুঠি লুট করলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি অর্থ-ভাণ্ডার পুষ্ট করা যায়।

তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'তাহলে আপনি হবেন নেতা।' মজনু সর্দার জানান।

'আমি রাজী।' মহেশ্বরজী বলেন।

'কোন্ কুঠি?'

'ঢাকা—'

'কিভাবে যাবেন?'

'জলপথে—'

'বেশ। তৈরী হোন।'

সে সময়ে নদী দিয়ে যাওয়া-আসা করাই ছিল সহজ পথ। স্থল-পথে তেমন সুবিধা ছিল না। তাছাড়া, ব্রহ্মপুত্র নদ তখন বহুদূর দিয়ে আজকের মৈমনসিংহ শহরের গা ঘেঁষে বয়ে যেত বলে পুব-বাংলায়

যাতায়াতে জলপথই ছিল প্রধান পথ। তিস্তাও তখন পুবদিকে প্রবাহিত না-হয়ে দক্ষিণে বয়ে যেত। এসব কারণে নদীপথই বেছে নেয় মানুষ।

ওদিকে করতোয়ার তীরে মহাস্থানগড়ে, পৌণ্ড্রবর্ধনে, গৌড়ে নানা জায়গায় ছিল সন্ন্যাসীদের নৌ-ঘাঁটি। তাদের রণতরী ছিল। অস্ত্র ছিল। প্রত্যেক ঘাঁটির সঙ্গে তাদের যোগ ছিল। প্রয়োজনে সাহায্য পাঠাত। মজনু সর্দারের দূরদর্শিতায় এসব সম্ভব হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক। তাঁকে সবাই মান্য করত এবং নির্দেশমতন চলত।

'মহেশ্বরজী, আপনার যা-যা প্রয়োজন সব পেয়ে গেছেন কি?' জিজ্ঞেস করেন মজনু সর্দার।

'আজ্ঞে হ্যাঁ'। মহেশ্বরজী বলেন, 'আপনার নির্দেশে ছিপনৌকো এসে গেছে। অস্ত্র পেয়েছি। সঙ্গীরা প্রস্তুত।'

'তাহলে—'

'আমরা আগামীকাল ঊষালগ্নে যাত্রা করব।'

'আপনাদের যাত্রা শুভ হোক—'

সাত

ঢাকার কুঠি

ঘাটে নৌ-বহর বাঁধা। অসংখ্য ছিপ। মাঝখানে একটি রণতরী।

অনুকূল স্রোতে ভেসে চলল বহর। হাওয়া লেগেছে পালে। রণতরী চলেছে শনশনিয়ে, আগে-পিছে ছিপ। সন্ন্যাসী-কোটা পড়ে রইল পেছনে।

মহেশ্বরজীর বাহিনী চলেছে।

বেলা যত বাড়ে, ওদের নজর তত প্রখর হয়। সবাই নজর রেখেছে নদীর বুকে। এইভাবে নজর রাখার অর্থ যদি নিশানওয়ালা ইংরেজদের কোনো নৌকা দেখা যায়। নৌকাযোগে টাকাকড়ি ও রসদ সরবরাহ করে ইংরেজের কর্মচারীরা। তারা এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে যায়। কখনও কলকাতায় রাজস্ব জমা দিয়ে আসে। নিশান-উঁচানো নৌকা আসতে দেখলে জেলে-নৌকাগুলো ভয়ে সরে যায়—স্নানের জন্যে আসা লোকেরা পর্যন্ত জল থেকে উঠে পড়ে ঘাটেব ওপরে।

এই রকম এক নৌ-বহরের সঙ্গে দেখা হয় মুখোমুখি। সামনে-পেছনে রক্ষীনৌকা। মাঝের নৌকাটিতে নিশান উড়ছে।

'কে যায় ?' এরা হাঁক দেয়।

ও-তরফ উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করে না। তাদের বহর যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে।

'উত্তর দিচ্ছ না কেন ? নৌকা ভেড়াও—'

এদের হাঁক শোনা যায় জোরে।

'কে ? কারা নৌকা ভেড়াতে বলে ?' ওরা তেতে উঠে বলে, 'নিশান দেখে বুঝতে পারছো না আমরা কারা ? এ হল ইংরেজ বাহাদুরের নৌকা—'

'হুররে।' উল্লাসধ্বনি ওঠে একটা।

রণতরীর ভেতর থেকে বন্দুকের শব্দ শোনা যায়—দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম। ওদের নৌকা থেকে ভেসে আসে আর্তনাদ। ছিপনৌকাগুলো টলমল করে উলটে যায় আর নিশানওয়ালা বড়ো-নৌকাটি স্রোতে পাক খেয়ে রণতরীর গায়ে এসে ঠেকে। মহেশ্বরজী ঝাঁপিয়ে পড়েন। ক্ষীণ বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। সন্ন্যাসীদল নেমে পড়ে রে-রে করে। বাধা দূর হয়ে যায়। অবশিষ্ট প্রহরীরা নদীর জলে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়।

অর্থ বিশেষ ছিল না, রসদ ছিল বেশি। এক-কুঠি থেকে পাঠানো হচ্ছিল অন্য কুঠিতে। যথালাভ।

মাঝপথে আর নিশানওয়ালা নৌকা দেখা গেল না। অবশেষে তারা ঢাকা পৌঁছোয়।

ঢাকায় ইংরেজদের কুঠিটা ছিল প্রকাণ্ড। লিস্টার নামে এক সাহেবের ওপর ছিল কুঠি দেখাশোনার ভার। সে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, নেটিভ-দস্যুরা এতখানি দুঃসাহসী হবে—তৈরী ছিল না মোটে। কুঠি-রক্ষার জন্যে সৈন্যসংখ্যা ছিল না তেমন। তাই অনুচর-মারফত যখন জানতে পারল যে, 'দস্যুরা' নদীবক্ষে লুট করতে করতে এই কুঠি-ঘাটে এসে নেমেছে, তখন বিচলিত হয়ে পড়ল। সব ইংরেজই তো সাহসী নয়। লিস্টার সাহেব অস্থিরপদে পায়চারী করে আর বিড়বিড় করতে থাকে; 'টু বী অর্ নট টু বী···।' ইংলণ্ড থেকে নতুন এসেছে, থিয়েটারের ভক্ত, সেখানে হ্যামলেট দেখেছিল লিস্টার সাহেব।

'হুজুর—'

চর প্রবেশ করে। তার ভঙ্গি সন্ত্রস্ত। সে কাঁপছিল

'কী হয়েছে? হোয়াট নিউজ?'

লিস্টার সাহেব তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'হুজুর, ওরা এসে পড়েছে—'

চর জানায়।

'কারা? হু আর দে?'

চর বলে, 'হুজুর, ওরা সন্ন্যাসীদল। ডোণ্ট কেয়ার। ডেন্‌জারফুল—'

'হোয়াট?'

চর সাধ্যমতন ইংরেজি বলতে চেয়েছিল, সাহেব বুঝতে পারছে না দেখে চোখে-মুখে আতংকের ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলে, 'বিগ্, ভেরি বিগ্ ইয়ে, হুজুর। ভয়ংকর—'

সাহেব বলে, 'ওয়েল লেট দেম্ কাম্।'

চরের মুখে যেটুকু জানা গেল, সাহেব তাতে বিচলিত হল আরও। টু বী অর্ নট টু বী—আওড়াতে লাগল ঘন ঘন। তাহলে কী কর্তব্য? লড়াই করে মরা, নাকি পালিয়ে গিয়ে বাঁচা? বেঁচে থাকলে চাকরি ও অর্থের অভাব হবে না। কিন্তু মরে গেলে···

চর বলে, 'এখনও সময় আছে, হুজুর।'

'চলো।'

খিড়কির পথ খোলা ছিল, সেইদিকে চলে গেল লিস্টার সাহেব।

কুঠি দখল হল বিনা প্রতিরোধে। ধনসম্পত্তি ও মূল্যবান জিনিস যা ছিল, সব তুলে নিয়ে এল ওরা। জয়ধ্বনিতে মুখর হল নদীর ঘাট।

আট

রামপুর-বোয়ালিয়রের কুঠি

মজনু সর্দার ভেবে রেখেছিলেন, আক্রমণ পরিচালনা করতে হলে একযোগে বিভিন্ন কুঠি আক্রমণ করাই উত্তম কৌশল। তা না করলে ইংরেজ-কুঠিয়ালরা সতর্ক হয়ে যাবে। তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সেজন্যে তিনি মহেশ্বরজী রওনা হওয়ার পরই ডাক দিলেন মকবুল মহম্মদকে। বললেন, 'মকবুল, তোমাকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে।'

মকবুল বলে, 'আদেশ করুন—'

'তোমাকে যেতে হবে রামপুর-বোয়ালিয়র। সেখানকার ইংরেজ-কুঠি দখলের ভার দিলুম তোমার ওপর—'

মকবুল জানতে চায়, 'কখন্ যেতে হবে?'

'যত শীঘ্র সম্ভব—'

মকবুল বলে, 'তাই হবে সর্দারজি।'

রামপুর-বোয়ালিয়রের কুঠি-রক্ষার ভার ছিল বেনেট সাহেবের ওপর। তার সৈন্যশক্তি ঢাকার লিস্টার সাহেবের মতন, অল্প। এ কুঠিতে ধনসম্পত্তি প্রচুর, কিন্তু সেই অনুপাতে সৈন্যসংখ্যা কম। কুঠি কোনদিন বেদখল হতে পারে এমন চিন্তা তার মনেও আসেনি।

তবে লিস্টার সাহেবের মতন ভীরু সে নয়। ওদের আসার খবর পেয়ে সৈন্যদের জমায়েত হবার আদেশ দেয় এক জায়গায়। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে সে বলে, 'খবরদার, কেউ পালাবে না। তোমরা হাতিয়ার তুলে তৈরী হও। অ্যাটেনশন—'

সৈন্যদের বুটে বুটে ঠোক্কর লাগে। সিধে হয়ে দাঁড়ায় সবাই। বেনেট সাহেব বন্দুক উঁচিয়ে সবার সামনে।

মকবুল এসে পড়ল সদল-বলে। হই-হই, চিৎকার, আর্তনাদ। ছোটখাট লড়াই হয় একটা। বেনেট সাহেব দারুণ বিক্রমে লড়ে যায়। কিন্তু টিকতে পারে না বেশিক্ষণ। পরাজিত হয়। সাহেবকে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলল ওরা। জ্যান্ত এক সাহেবকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে, ওদের আনন্দ দেখে কে!

অনেকক্ষণ চলার পর নৌকা থামে এক ঘাটে। খিদে পেয়েছে। আহার করতে হবে।

বেনেট সাহেব বসেছিল উলটো দিকে মুখ করে। ওরও খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। বন্দী বটে কিন্তু মানুষ তো!

মকবুল এক থালা গরম ভাত এনে বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। বলে, 'খাও সাহেব—' বেনেট বসে থাকে আগের মতন। আগ্রহ দেখায় না।

'ও, ভাতে বুঝি রুচি নেই!' মকবুল বলে, 'বেশ চিঁড়ে খাও—'

সাহেব তবু ফিরে বসে না।

'এতেও মন উঠল না?' মকবুল এবার চটে যায়ঃ 'থাকো তবে শুকিয়ে—'

বেনেট ঘুরে বসে। বলে, 'আমি ভাতও খাই না, চিঁড়েও খাই না। আমি একজন ইংরেজ। আমার খানা আলাদা।'

'তোমার মনের মত খানা এখন পাব কোথায়? এটা ইংলণ্ড নয়, ইণ্ডিয়া। তোমার কুঠি নয়, নদীর ঘাট। বায়নাক্কা তো মন্দ নয়!'

'যদি মাংস থাকে, একটুকরো দিতে পারো—'

'মাংস! সাহেব আমরা অহিংস।'

'সে কী—' সাহেব রীতিমত বিস্মিত।

'কেন? মানুষ কি অহিংস হতে পারে না?'

'নিশ্চয় পারে। কিন্তু চোখের সামনে দেখলাম তোমরা কতকগুলো লোক খুন করলে। এটা কী অহিংসার পরিচয়?'

'কুঠি দখল করতে হলে এটুকু না-করে উপায় ছিল না—'

'এ তো এক ধরনের ডাকাতি!'

'তোমরাই এই ডাকাতি আমাদের শিখিয়েছো।' মকবুল রেগে গেছে, সে উত্তেজনায় কাঁপছিল: 'তোমরা এদেশে এসেছিলে নবাব-বাদশার অনুগ্রহ পাবার আশায়। অনুগ্রহ তোমরা পেয়েছিলে। কিন্তু তারপর? ছল-চাতুরী আর হামলাবাজী করে গোটা দেশ দখল করে বসলে। এসব শিখেছি তোমাদের কাছ থেকেই—'

বেনেট সাহেবের ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমারও কিছু বলার আছে।'

'বলো—'

বেনেট বলে, 'ছাখ, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি বহু দেশ ঘুরেছি এবং বহু জাতের সঙ্গে মিশেছি, সত্যি কথা বলতে-কি, সব দেশেই কিছু স্বার্থান্ধ লোভী লোক আছে—কিন্তু এই হিন্দুস্থানে এসে, বিশেষ করে বাংলা মুল্লুকে, এই বাঙালীর মতো ভীরু অপদার্থ মেরুদণ্ড-হীন জাত আর ছুটি দেখিনি। ইয়ংম্যান, তুমি ভেবে দেখ, তোমাদের জাতের সেই দুর্বলতার সন্ধান যদি আমরা না পেতাম, তাহলে বিদেশী—আমাদের সাধ্য ছিল কি, তোমাদের বুকের ওপর বসে তোমাদের হুকুম চালাই? আমাদের এই ক্ষমতা পেতে সাহায্য করেছে কারা? তোমরা, তোমাদের গোটা জাতটাই। আমরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছি মাত্র—'

মকবুল চুপ।

বেনেট বলে, 'ইয়ংম্যান, আরও একটা কথা বলি। তোমরা কুঠি আক্রমণ করে কিছু অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারছো বটে, কিন্তু এর পরিণাম ভেবে দেখেছো কী?'

মকবুল পালটা বলে, 'সাহেব, তোমরা কী ভেবেছো তোমরা বরাবর থেকে যাবে এদেশে? তা হয় না। আমরা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাব, সেকথা জেনেই এপথে এসেছি, কিন্তু আমাদের পর আর-এক দল

আসবে। এইভাবে দলের পর দল। কেননা, এদেশ আমাদের। আমরাই রাজা হব এদেশে—'

বেনেট বলে, 'খুব ভাল কথা। ইয়ংম্যান, তোমরা একযোগে যেদিন জোট বাঁধবে, সেদিন এত গোলাগুলি আর রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাব। তোমরা কী একজোট হতে পারবে? সেই চেষ্টা আগে করো। দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুললে আমাদের সাধ্য-কি এদেশে থাকি?'

মকবুল এবারেও কোনো কথা বলতে পারে না। সাহেবের কথাগুলো তার মনে লাগে। কথাগুলো খাঁটি।

মকবুল বলে, 'সাহেব, তুমি কোথায় যেতে চাও? আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি—'

'ওয়েল,' বেনেট বলে, 'আমি পাটনার কুঠি থেকে এখানে এসেছিলাম। তুমি আমাকে পাটনায় ফেরার বন্দোবস্ত করে দিলে খুশি হব—'

মকবুল ঘোড়া জোগাড় করে দেয় একটা। সাহেবের হাতে লাগাম তুলে দিয়ে বলে, 'যাও সাহেব—'

নয়

রংপুরের কুঠি

মজনু সর্দার ডাক দিলেন, 'মেঘনাদ—'

বন্ধু মকবুল রামপুর-বোয়ালিয়রের দিকে রওনা হওয়ায় মেঘনাদ একা হয়ে গিয়েছিল। মন খারাপ। যেন তার যোগ্যতা নেই। অভিমান হচ্ছিল।

ডাক শুনে কাছে আসে মেঘনাদ। 'সর্দারজি—'

'তুমি রওনা হও রংপুরে।'

মেঘনাদ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। 'কখন সর্দারজি—'

'আজ এবং এখনই।'

মেঘনাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে মহাখুশি। তার মনের দুঃখ দূর হয়ে গেল। মকবুলের মতন সে-ও এখন একটা পুরো-দলের নেতা।

সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল। নেতার নির্দেশে ছুটে চলল তারা।

রংপুরের কুঠি-রক্ষার ভার ছিল মার্টল নামে এক সাহেবের ওপর। অন্য কুঠির চেয়ে এ কুঠিতে সৈন্যসংখ্যা ছিল বেশি। কিন্তু সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে কয়েক শত রণ-নিপুণ সন্ন্যাসী-সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল তারা। মার্টল সাহেব তাদের ঠিকমতন পরিচালনা করতে পারল না। ফলে তার পরাজয় ঘটল।

রংপুর কুঠিতে মজুত অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে মেঘনাদের দল।

দশ

ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি

এইভাবে একযোগে বিভিন্ন কুঠি আক্রমণ করে সংগ্রহ-ভাণ্ডার ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে উঠল। সন্ন্যাসী-কোটাই ছিল মূল কেন্দ্র। কিন্তু এই আক্রমণগুলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দেশের সর্বশ্রেণীর মনে তেমন আলোড়ন তুলতে পারেনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চিন্তা মজনু সর্দারের মনে ছিল, কিন্তু একা তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সব লোকের মানসিকতাও এক নয়। সেজন্যে তাঁর প্রচেষ্টা দানা বাঁধতে পারেনি। তাঁর বুদ্ধি ছিল, সাহস ছিল, সংগঠন করার ক্ষমতা ছিল, গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল জানা ছিল। তিনি বড়ো আন্দোলনের কথা ভাবছিলেন।

এমন সময় খবর এল, ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে আসছে সৈন্যবাহিনী। সব খবরই পৌঁছেছিল কলকাতায়। কুঠি আক্রমণের মতন ছুটকো-উৎপাত তারা আর বরদাস্ত করতে রাজী নয়। এ থেকেই বড়ো-গোছের উপদ্রব দেখা দিতে পারে। সেজন্যে কলকাতা থেকে ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জিকে পাঠানো হয়েছে। তার আগমন ও সৈন্যসংখ্যা দেখে রংপুরবাসীব চক্ষু স্থিব! তারা বলাবলি করল, 'এ যে মশা মারতে কামান দাগানো! এবার সন্ন্যাসী-দলের আর নিস্তার নেই। তোপের মুখে উড়ে যাবে সবাই—'

বাস্তবিক ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি ছিলেন ঝানু সেনাপতি। তিনি এসেছেনও সেইরকম। কামান ছিল, সেই কামান কখনও নদীপথে কখনও শকটে বয়ে আনা হয়েছে। বন্দুকধারী পল্টন ছিল একসারি। তারা এল গ্রামের মাটি কাঁপিয়ে। ব্যাপার দেখে গ্রামবাসীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি গ্রামে ঢুকে তখনি লেগে গেলেন 'পাজি' সন্ন্যাসীদের খোঁজে। লোক পাঠালেন চারদিকে। তারা ফিরে এসে যে-খবর দেয়, তাতে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ভুরু কুঁচকে ওঠে। ভুল জায়গায় এলেন নাকি? দূতের খবর, শুধু রংপুর কেন, সারা উত্তরবঙ্গে একটিও সন্ন্যাসী নেই!

'হতে পারে না।' ক্যাপটেন রেগে গেলেন, 'গো এগেন। আবার যাও। নিশ্চয় আছে। ভাল করে খোঁজ নাও। গো—'

সংবাদদাতারা আবার দৌড়ল। খোঁজ নিল নানাভাবে। কিন্তু ফল সেই এক। কারো সন্ধান পেল না।

'স্ট্রেঞ্জ!' ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি দারুণ বিস্মিত হলেন। চরেরা মিথ্যা কথা বলছে না তো? এ কখনও হতে পারে?

'ওয়েল।' তিনি বলেন, 'আমি নিজে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি নিজেও ঘুরে এলেন সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায়। আশ্চর্য! কোথাও একজন সন্ন্যাসী নেই। অথচ যেসব সাধারণ মানুষের কাছে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন, তারাই যে সাজ-বদল-করা সন্ন্যাসী তা তিনি টের পেলেন না।

হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি। সন্ন্যাসীরা নেই তো দমন করবেন কাদের?

এগারো

লেফটেনাণ্ট কীথ

দ্বিতীয় দফায় এলেন লেফটেনাণ্ট কীথ। সন্ন্যাসী-দল যে নেই এ হতেই পারে না। বিভিন্ন কুঠি আক্রমণ কি মিথ্যা? কুঠি লুঠ করে তারা যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। ওরা আছেই। যেভাবে হোক ওদের দমন করা চাই।

লেফটেনাণ্ট কীথের ওপর সেইরকম নির্দেশ ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর পূর্ববর্তী দলনেতা ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি সন্ন্যাসীদের সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। তাই লেফটেনাণ্ট কীথ সামান্যতম সংবাদও অবহেলা করলেন না, সন্দেহজনক একটি ব্যক্তিও নিস্তার পেল না। ফলে, নিরীহ সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা তাঁর হাতে নিগৃহীত হল। তারা সন্ন্যাসী দলের কেউ নয়, সাধারণ ফকির-সন্ন্যাসী মাত্র।

ওরা তাহলে গেল কোথায়? ভোজবাজি নাকি? ভারতবর্ষ যাদুবিদ্যা মন্ত্র-তন্ত্রের দেশ, ওরা কী হাপিশ হয়ে গেল? অসম্ভব। কীথ তা বিশ্বাস করেন না।

তিনি চর নিযুক্ত করেছিলেন যথারীতি। তাঁর চরেরা চলে গিয়েছিল আরও দূরে। সেখান থেকে খবর আনল, সন্ন্যাসীদল অবস্থান করছে নেপালের দিকে, ভারত-নেপাল সীমান্ত অঞ্চলে এক জঙ্গলে।

তৎক্ষণাৎ বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন লেফটেনাণ্ট কীথ।

নেপালের তরাই অঞ্চলে মোরাং নামে এক জায়গায় সত্যি সত্যি একটি দল আত্মগোপন করেছিল। এই দলের দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেধে গেল সংঘর্ষ। এ-পক্ষ যেমন গুলিগোলা চালাতে পারে ও-পক্ষও তেমনি। পালটা-পালটি চলল কিছুক্ষণ। কীথ সাহেব ভাবতে

পারেননি, অল্প কিছু সন্ন্যাসী-সৈন্যের কাছে তাঁর বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য নাস্তানাবুদ হবে। তিনি প্রথম দফায় পিছু হটে এলেন বটে, কিন্তু তাঁর জেদ চেপে গেল ভীষণ।

জায়গাটা ছিল পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা। তাঁর অপরিচিত জায়গা। তিনি ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কোন্‌দিক দিয়ে আক্রমণ করবেন বুঝতে না পেরে সৈন্য-পরিচালনা করলেন ভুলপথে। তার ফলে শক্তি ক্ষয় হল প্রচুর। লুকিয়ে থাকা সন্ন্যাসী-দল গুলি চালিয়ে গেল নির্ভুল লক্ষ্যে। কীথ পড়লেন বিপাকে। তাঁর সৈন্য মারা পড়ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। অথচ কোথা থেকে গুলি আসছে ঠাহর করতে পারছেন না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। শেষে মরিয়া হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন নিজে, ফল পেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গুলি এসে লাগল তাঁর বুকে। তিনি ঢলে পড়লেন। বাকী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বারো

ক্যাপটেন এডওয়ার্ড

খবর পৌঁছোয় উঁচুমহলে।

ক্রোধে ফেটে পড়ে সবাই। এ কী! এ যে ভীষণ ব্যাপার! বিদ্রোহ, চারিদিকে বিদ্রোহ। ওদের দল সুগঠিত এবং বোঝা গেছে ওরা যুদ্ধ জানে। ওদের দল ভবিষ্যতে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। অবহেলা করা চলবে না। এ ব্যাপার থামাতেই হবে।

অতএব কুঠিতে-কুঠিতে বাড়িয়ে দেওয়া হল সৈন্যসংখ্যা। প্রতি ঘাঁটিতে মোতায়েন করা হল জোরদার পাহারা। জাল ছড়িয়ে দেওয়া হল বড়ো করে।

ব্যর্থ হয়েছে দুই অধিনায়ক। একজন ফিরে এসেছে ম্যাজিকের ভাঁওতায়, অন্যজন ফিরে আসতেই পারেনি, নিহত। এর শোধ তুলতে হবে। কাকে পাঠানো যায়? হাঁ, ক্যাপটেন এডওয়ার্ড। পাকা লোক। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি এক সময় সেনাপতি ছিলেন স্বদেশে। তাঁকে সম্মানসূচক 'ক্যাপটেন' উপাধি দেওয়া হয়েছিল বীরত্বের জন্যে। এবার পাঠানো হল তাঁকেই।

এ খবর চাপা রইল না।

সন্ন্যাসীদলের সতর্কতার প্রয়োজন হল আরও বেশি।

মজনু সর্দারের নির্দেশে সন্ন্যাসী সৈন্যগণ কখনও এক জায়গায় থাকত না। জলে-স্থলে নানা জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াত। এক সঙ্গে সবাই যাতে ধরা না পড়ে, সেজন্যে ভাগ হয়ে থাকত নানা উপদলে।

এইরকম এক উপদলের সঙ্গে দেখা হল ক্যাপটেন এডওয়ার্ডের। ওরা তখন গোল হয়ে খেতে বসেছিল। সবাই ঘেরাও হয়ে গেলেন।

ক্যাপটেন এডওয়ার্ড গর্জন করে উঠলেন, 'ফায়ার—'

আশ্চর্য! সৈন্যরা দাঁড়িয়ে রইল কাঠের পুতুলের মতন।

'ফায়ার—'

তিনি চিৎকার করে উঠলেন আবার। সৈন্যরা তবু বন্দুক তুলল না।

ক্যাপটেন এডওয়ার্ড দাঁত কিড়মিড় করে এগিয়ে গেলেন সুবাদার আনন্দরামের কাছে। ক্রোধে তাঁর চোখ-মুখ লাল। কাঁপছিলেন।

বললেন, 'সুবাদার, আই সে ফায়ার—'

আনন্দরাম বলে, 'হুজুর, মাফ্ করুন। আমি গুলি ছুঁড়তে পারব না।'

'কেন?'

'ওরা খেতে বসেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ শত্রু হলেও গুলি করা যায় না। ওদের খাওয়া হোক—'

'আমাদের উপস্থিতি জানতে পারলে ওরা চোখের নিমেষে পালিয়ে যাবে কিংবা পালটা আক্রমণ করবে। তখন?'

'আমরা জবাব দেব—'

'সুবাদার, এখনও বলছি বন্দুক তোলো।'

'মাফ করো সাহেব—'

'অল্ রাইট।'

বুটের তলায় পিষে ফেলতে ইচ্ছে হল ওকে। অবাধ্য! ও জানে না এই অবাধ্যতার পরিণাম কী হতে পারে। এই বেআদপির সাজা এখন তোলা থাক্। আপাতত কাজ হল শত্রুদের ধাওয়া করা। ওরা যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

ক্যাপটেন এডওয়ার্ড তাই করলেন। ছোট একটি বাহিনী নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন। সুবাদারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির সময়ে ওরা টের পেয়ে গিয়েছিল তাঁদের উপস্থিতি এবং খাওয়া ফেলে নিমেষে অন্তর্হিত হয় জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলে আত্মগোপন করে ওরা লক্ষ্য রাখছিল সাহেবের গতিবিধি।

ক্যাপটেন এডওয়ার্ডের দল কাছাকাছি আসতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে আচমকা ছুটে এল ঝাঁক-ঝাঁক গুলি। ক্যাপটেন এডওয়ার্ড রক্ষা পেলেন না, পড়ে গেলেন। তাঁর বাহিনী থমকে যায়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যায় ওরা।

এই ঘটনা আনন্দরামের মনে রেখাপাত করে। তার অনুশোচনা হয়। সে কলকাতায় ফিরে উচ্চ-মহলে ঘটনার বিবরণ জানাল।

ঘটনার বিবরণ অবশ্য তার আগেই ওরা জেনে গিয়েছিল।

'তুমি সুবাদার আনন্দরাম ?'

'হ্যাঁ হুজুর—'

'ওকে এখনি বন্দী করো।'

'হুজুর, আমি নিজেই এসেছি। পালাব না—'

বিচার হল নামমাত্র। রায় বেরুল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আনন্দরামকে পড়ে শোনানো হল।

'শোনো আনন্দরাম, তোমার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে—'

আনন্দরাম চুপ করে রইল।

'তোমার কোনো প্রার্থনা আছে ?'

'না হুজুর।'

'তোমাকে ফোর্ট উইলিয়মের সামনে দাঁড় করিয়ে তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া হবে—'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ইংরেজরা যেন বেশিদিন এদেশে না থাকে।'

আদেশ প্রতিপালিত হয়। আনন্দরাম তোপের মুখে উড়ে যায়।

তেরো

সন্ধানে

কিন্তু এভাবে কী জ্বালা মেটে? একজন মাত্র সুবাদারকে তোপে উড়িয়ে দিয়ে কতটুকু লাভ হল? এর বহুগুণ শোধ তুলতে না পারলে মৃত অধিনায়কদের আত্মা শান্তি পাবে কী?

পাঠানো হল ঝাঁক-ঝাঁক সৈন্য। সর্বত্র অনুসন্ধান চলুক। এক-পা জমিও যেন ফাঁক না থাকে।

ফলে, গোপন স্থানগুলো আর গোপন রইল না। সন্ন্যাসীদল আত্মরক্ষা করার জন্যে পিছু হটতে লাগল। কিন্তু পিছু হটতে হলেও তো জায়গা লাগে। যেদিকে পিছু হটে সেখানেই ইংরেজ-সৈন্য। ফলে সংঘর্ষ বেধে যায়। ইংরেজ-সৈন্যরা আগের মতন আর ঢিলেঢালা নয়। তাদের প্রচণ্ড চাপে দিশেহারা হতে হয়, ক্ষতি হয় প্রচুর। সন্ন্যাসী-সৈন্য মারা পড়তে থাকে, দল ছোট হয়ে আসে ক্রমশঃ। এই অবস্থায় সকলকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলেন লেফটেনাণ্ট টেলর। তিনি আয়োজন করেছিলেন বিরাট। তবু তাঁর জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলেন মজনু সর্দার ও অবশিষ্ট দল।

মজনু সর্দারের পলায়ন-সংবাদ শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। লেফটেনাণ্ট টেলর পারলেন না দলের গোদা মজনু সর্দারকে ধরতে কিংবা খতম করতে—তিনি ফিরে এলেন। এবার পাঠানো হল কোলি সাহেবকে। তাঁরও খ্যাতি দুর্ধর্ষ সেনাপতি হিসেবে। তবু তিনি পারলেন না। সন্ন্যাসী-সৈন্যদের গোপন আক্রমণে দারুন বিব্রত হলেন। কোথা দিয়ে গুলির ঝাঁক এসে তাঁর সৈন্যদের শেষ করে দিচ্ছে, কোলি সাহেব অনুধাবন করতে পারলেন না। খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে গিয়েও ওদের গুলি-বর্ষণ থেকে রক্ষা পেলেন

না, গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসছে গুলির ঝাঁক। বিব্রতকর অবস্থা। তাঁর সৈন্যরা তো মারা পড়ছিলই, তিনি নিজে বেঁচে গেলেন অল্পের জন্যে। পিছিয়ে এলেন।

সেই ফাঁকে ওরা অন্য জায়গায়। অতি দ্রুত এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে। কোলি সাহেব ওদের হদিশ আর পেলেন না।

তবু ইংরেজ-সৈন্য টহল দিতে থাকে উত্তরবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত।

চোদ্দ

পরামর্শ

ওরা এবার মিলিত হয়। মজনু সর্দারকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তিনি বললেন, 'ইংরেজরা খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। চারদিকে সৈন্য—'

মকবুল বললে, 'সর্দারজি, এভাবে আত্মগোপন করে বেশিদিন থাকা যাবে না। তার চেয়ে সকলে মিলে মুর্শিদাবাদের কুঠি আক্রমণ করলে কেমন হয়? তাতে ইংরেজরা ভয় পাবে এবং আমাদের মনের জোর বাড়বে।'

মজনু সর্দার বললেন, 'ইংরেজরা ভয় পাবে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের মনের জোর আছে এবং বরাবর থাকবে। তবে মুর্শিদাবাদের কুঠি আক্রমণ করার সময় এখন নয়—'

মেঘনাদ বলে, 'আমি বলি, সোজা কলকাতা যাওয়া যাক। মূল ঘাঁটি আক্রমণ করে ওদের উচ্ছেদ করা হোক।'

মজনু সর্দার বলেন, 'তুমি আরও ছেলেমানুষ—'

'আমরা কতদিন অপেক্ষা করব?'

'আমি একজনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাহায্য এসে পৌছুলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। তার সময় ঘনিয়ে এসেছে—'

মজনু সর্দার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন নাটোরের মহারানী ভবানীর কাছে। তিনি সাহায্য পাঠালেন না। ওরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল নানা উপদলে ভাগ হয়ে। সাবধানে চলাফেরা করতে লাগল সন্ন্যাসীরা।

তবু সংঘর্ষ বাধল।

রংপুরের পশ্চিমপ্রান্তে শ্যামগঞ্জ নামে একটি জায়গা। মকবুল ও তার দল যতদূর সম্ভব আড়ালে-আড়ালে পথ অতিক্রম করছিল। তবুও সংঘর্ষ এড়ানো গেল না। মকবুল বুঝতে পারল, ওদের চোখে

ধরা পড়ে গেছে তারা। জঙ্গল ভাঙ্গার শব্দ শোনা যাচ্ছে, অনুসরণ করে আসছে ওরা। মকবুল দ্রুত নির্দেশ দিল, 'ভাই-সব, পিছু হটো। বড়ো গাছের আড়াল নাও। শুয়ে পড়ো।'

সে কিছু সৈন্যকে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে যেতে বলে।

'তাড়াতাড়ি যাও। ভেতরে ঢুকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করো, থেমে থেমে, বেশ কয়েকবার। যাও—'

কিন্তু সামনের দিকে রইল বেশি সৈন্য।

এই কৌশল ধরতে পারলেন না ইংরেজ-বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপটেন টমাস। জঙ্গলের ভিতর থেকে-আসা গুলির শব্দ লক্ষ্য করে সৈন্য-চালনা করলেন তিনি। গুলি-বিনিময় চলতে লাগল। ওরা আরও পিছিয়ে যায়, এরা আরও ভিতরে ঢোকে। মকবুল এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। তার দল পিছন থেকে হঠাৎ ঘিরে ফেলল ওদের। ইংরেজ-বাহিনী হতভম্ব। কোন্‌দিক সামলায়?

এক দেশিসৈন্য তাড়াতাড়ি ঘোড়া এনে লাগাম তুলে দেয় ক্যাপটেন টমাসের হাতে। বলে, 'হুজুর, শীঘ্র পালান—'

ক্যাপটেন টমাস রেগে বলেন, 'মূর্খ. ইংরেজ কখনও প্রাণভয়ে পলায়ন করে না।'

পরক্ষণে একটি গুলি এসে বিঁধল তাঁর বুকে। তাঁর হাতের বন্দুক খসে পড়ল। তিনি টলে পড়ে গেলেন মাটিতে।

অধিনায়কহীন ইংরেজ-সৈন্যবাহিনী যতক্ষণ পারল লড়ল, তারপর ভঙ্গ দিল রণে।

···ওরা মিলিত হল আবার।

মকবুল ডাকল, 'মেঘনাদ—'

'কি রে?'

মেঘনাদ বলে, 'এবার কুমারখালি—'

'হ্যাঁ চল্‌।'

ওরা পদ্মা পার হয়ে চলল কুমারখালির দিকে।

পনেরো

পাটগ্রামের জঙ্গলে

গুডল্যাড সাহেব এই সময় রংপুরের কালেক্টর। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র—প্রকৃতপক্ষে একটি অপদার্থ। তাঁর দিবসে ও রাত্রে নিদ্রাটি ছিল সাধা। সেকালের কুম্ভকর্ণ আর-কি। ভুঁড়িটি ছিল দেখবার মতন। ভোজন-প্রিয় ব্যক্তি। খেতে পারতেন খুব। জলযোগের জন্যে রোজ সকালে দুটো আর বিকেলে দুটো মুরগি ছিল বাঁধা। দুপুরে ও রাত্রে সেই অনুপাতে ভোজ। মোটাসোটা মানুষ। চলতে-বসতে অসুবিধে—কাজকর্ম ঢিলেঢালা। করিৎকর্মা লোক পেয়েছিলেন একটি—সে তার ডানহাত। সে দেবী সিংহ। নানান উত্থান-পতনের পর দেবী সিংহ তখন গুডল্যাড সাহেবের অধীনে 'বিশ্বস্ত' কর্মচারী। রতনে চিনেছিল রতন। দুজনে ছিল দুজনের ওপর নির্ভরশীল। ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো সমান-সমান।

তবু গুডল্যাড সাহেব মাঝে মাঝে বলতেন, 'এসব কী হচ্ছে বল তো দেবী? ওরা কী আমাদের নিশ্চিন্তে খেতে-শুতে দেবে না? সব সময় কী-হয় কী-হয়—'

দেবী সিংহ বলে, 'আমি যে আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারছি না। আপনার ভাল-মন্দ দেখাও তো আমার কর্তব্য।'

'সে তো বটেই। তুমি পাশে আছো বলেই আমি নির্ভাবনায় থাকি—'

দেবী সিংহ বলে, 'ক্যাপটেন টমাসের সঙ্গে আমি থাকলে ওই শ্যামগঞ্জেই ওদের কবর দিতাম—নিশ্চিহ্ন করে দিতাম পুরো সন্ন্যাসী-দলটাকে। আমার খুব বিচ্ছিরি লাগছে। ওরা এখন কোন্‌দিকে, আপনি তার খবর জানেন?'

'হ্যাঁ। খবর পেয়েছি, ওরা এখন কুমারখালির দিকে—'

'ওখানকার কুঠির ভার কার ওপর ?'

'লেফটেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেব দেখাশোনা করেন—'

'তিনি কেমন লোক ?'

'শুনেছি জবরদস্ত ব্যক্তি—'

'তাঁর কাছে সংবাদ গেছে ?'

'আমি যখন পেয়েছি, তিনিও পেয়েছেন নিশ্চয়—'

'এবার তাহলে শায়েস্তা হবে ওরা। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ওরা লুটিয়ে পড়েছে পথের ধুলোয়।'

'তুমি দেখতে পাচ্ছো ?'

'নিশ্চয়—'

গুডল্যাড সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন আনন্দে ; 'মুরগি—মুরগি—মুরগি আন্ আরো। দেবী, তোমার মুখে আস্ত মুরগির ঠ্যাং পড়ুক। ওহ্ গড্, সত্যি হয় যেন !'

হ্যাঁ, সত্যি হল। এবারের ঘাঁটিতে শক্ত প্রহরা। শ্যামগঞ্জের যুদ্ধের আগেই ক্যাপটেন টমাসকে সাহায্য করবার জন্যে যাত্রা করেছিলেন লেফটেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড—কিন্তু তাঁর পৌঁছুতে দেরি হয়ে যায়। টমাস সাহেবের মৃতদেহ দেখে তাঁর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসী-দলের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন।

ওরা কুমারখালির দিকে গেছে শুনে তিনি দ্রুত ফিরে এলেন নিজের কুঠিতে। কুমারখালির কুঠি-রক্ষার ভার তখন তাঁর উপর। চারদিকে মোতায়েন করলেন সৈন্য।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মকবুলের দল এসে পৌঁছল।

বেধে গেল লড়াই।

এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল যে, মকবুল সৈন্য সাজাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না। প্রথম থেকেই পিছু হটতে হল তাদের। ওপক্ষের

চাপে পিছু হঠতে হঠতে তারা একেবারে পাটগ্রামে। গ্রামের পিছনে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের পিছনে নদী।

মেঘনাদ বলে, 'ভাই মকবুল, আমরা এখন শেষ-সীমায় এসে গিয়েছি। আর পিছনো যাবে না। জঙ্গলের মধ্যেই আমাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে হবে।'

মকবুল বলে, 'না—'

'না কেন ?'

মকবুল বলে, 'ওরা সমস্ত জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে। কোনদিকে পালাবার পথ নেই। ওরা আমাদের খুঁজে বার করবেই—'

'তাহলে ?'

মকবুল বলে, 'ভাই মেঘনাদ, আমাদের কাছে একটিমাত্র পথ খোলা আছে এবং সে-পথ হল, সামনে এগিয়ে যাওয়া। এগোতে গেলে বাধা পাব। আমাদের সে-বাধা কাটাতে হবে—'

'কিন্তু আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম। গুলির অভাবে অনেক বন্দুক অকেজো।'

মকবুল বলে, 'এগিয়ে চলো। এসো ভাই-সব—'

তারা স্থানত্যাগ করার পরক্ষণে শোনা গেল, দুড়ুম—দুড়ুম—দুড়ুম। বন্দুকের শব্দ। খুব কাছে এসে গেছে ওরা।

চমকে ওঠে সবাই। জঙ্গলের এত গভীরে তারা, তবু ওরা টের পেয়েছে। এগিয়ে আসছে জঙ্গল ভেঙে। ডালপালা আন্দোলিত হচ্ছে সামান্য দূরে।

মকবুল আদেশ দেয়, 'তোমরা প্রস্তুত হও। বলো—দেশমাতার জয়। বলো, সন্ন্যাসীদলের জয়—'

সত্যি ইংরেজ-বাহিনী ঘিরে ফেলেছিল ওদের। চতুর্দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে ওদের কামান ছিল। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব আদেশ দিলেন, 'কামান দাগাও—'

শুকনো জঙ্গল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল জঙ্গলের

একাংশে। শুকনো ডালপালার মধ্য দিয়ে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। জ্বলে উঠল সারা জঙ্গল।

ম্যাকডোনাল্ড ও তাঁর সৈন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল আগুনের বৃত্তের বাইরে। কেউ বেরিয়ে এলেই গুলি। সবাইকার হাতে বন্দুক। ওরা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। আশ্চর্য, জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল না একজনও।

শৈশবের আমবাগান। কৈশোরের মোগলহাটের মেলা। যুবা-বয়সের পাটগ্রামের জঙ্গল। সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত দুটি তরুণের স্বপ্ন জ্বলে গেল অবরুদ্ধ অগ্নিশিখায়। ওরা অগ্নিশুদ্ধ হল একযোগে সবাই।

ষোল

অবসান

এরা সবাই চুনোপুঁটি। ফর-ফর করে শুধু। একটু টিপে ধরলেই ফরফরানি বন্ধ। একের পর এক তাই করা হয়েছে। কাত্‌লা? কাত্‌লাটি কোথায়? তাকে পাওয়া যায়নি এখনও।

উত্তরবঙ্গের পথে-ঘাটে বন্দুক-কাঁধে ঘুরে বেড়ায় ইংরেজদের সৈন্য। কোথাও বিপক্ষের নড়াচড়ার খবর পেলে ছোটে সেইদিকে। কাত্‌লার সন্ধান চাই। কোথায় আছে সে?

ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট এক বাহিনীর অধিনায়ক। তাঁর চেহারা বিরাট। ভীষণ জেদী। আর প্রতাপ তেমনি। সন্ন্যাসী-কোটা অরক্ষিত রেখেছিলেন তিনি ইচ্ছে করেই। ফাঁদে ফেলার ফন্দী। একদিনও কী আসবে না?

অন্ধকার রাত্রি। হঠাৎ শুনতে পেলেন ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সন্ন্যাসী-কোটার দিকে।

কে গেল এত রাত্রে? সন্ন্যাসী-কোটার দিকেই-বা কেন?

ক্যাপটেন স্টুয়ার্টের বিরাট দেহে উত্তেজনার ঢল নামে। তিনি তখনি আদেশ দেন, 'কুইক মার্চ—'

বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সন্ন্যাসী-কোটা ঘিরে ফেললেন ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট। বলে দিলেন, 'জীবিত কোনো মানুষ যেন বেরুতে না পারে। নাউ, ফলো মী—'

ছোট একটা দল নিয়ে সন্ন্যাসী-কোটার ভিতর ঢুকলেন তিনি। কে ঢুকেছে সন্ন্যাসী-কোটার ভিতরে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

কিন্তু কোথাও কারো সন্ধান পাওয়া গেল না। শূন্য কোটর। তাহলে কোথায় গেল অশ্বারোহী লোকটি? তিনি স্পষ্ট দেখেছেন, সে সন্ন্যাসী-কোটায় ঢুকেছে। তাহলে? গুপ্তকোটর আছে নাকি?

এই অন্ধকারে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। সকালের জন্যে অপেক্ষা করাও সমীচীন নয়। শত্রুকে সময় দিতে নেই।

'কামান। কামান দাগো। সন্ন্যাসী-কোটা উড়িয়ে দাও—'

ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট আদেশ দিলেন বজ্রগম্ভীরস্বরে।

কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়ে যায় এতদিনকার দুর্ভেদ্য দুর্গ সন্ন্যাসী-কোটা। এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট। ধ্বংসের কাজ শেষ হয়ে গেলে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

অতঃপর কালেক্টর গুডল্যাড সাহেব প্রচার করে দিলেন, 'বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। রাজস্ব-আদায়ের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। মহানুভব ইংরেজ সরকার-বাহাদুর দেশবাসীর কাছে শান্তি ও শৃংখলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে…'

মকবুল নেই। মেঘনাদ নেই। মজনু সর্দার নেই। বিদ্রোহ শান্ত হয়ে আসে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী-কোটার মাটিতেই বিলীন হয়ে আছেন মজনু সর্দার।

সন্ন্যাসী-কোটার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে মজনু সর্দারের লেখা চিঠির এক টুকরো। তাতে মজনু সর্দার লিখেছেন:

'আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমরা একদিন আমাদের দেশের রাজা হব। জয় দেশমাতার জয়—'